কানুনের কঠোর নিয়মের ভিতর দিয়ে বিচার করতে গেলে পদে পদে ঠকতে হবে ও সাহিত্যের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে।

শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী।

---

# জীবন।

আমাদের এই দুঃখদারিদ্র্য নিপীড়িত দেশে "জীবন" বল্‌তেই খুব একটা মনোরম ছবি চোখের সাম্‌নে ভেসে ওঠে না, এটা ঠিক। তবু আজ আমার এই জীবন সম্বন্ধে কয়েকটা কথা বল্‌বার ভারি ইচ্ছে হয়েছে।

আমরা সকলেই একটু মনোযোগ করে ইতিহাসের পাতা ওল্‌টালে, কিংবা সেকালের সাহিত্যের দিকে নজর দিলে বুঝ্‌তে পারি যে, ভারতবর্ষের জীবন ধারার মধ্যে এমন একটা বিশিষ্টতা ছিল এবং এখনও আছে, যা পাশ্চাত্য জীবনে মোটে নেই। আমাদের এই প্রাচ্য জীবন-ধারা খুব শান্তভাবে বয়ে গেছে, অতি ধীরে, অতি গম্ভীর তানে গান গেয়ে চলেছে কিন্তু তার মধ্যে কোথাও তরঙ্গের ঘাত প্রতিঘাত নেই, উদ্দাম উচ্ছ্বাসে বাঁকা পথে ছোটা নেই, জোয়ারের ফেনার সৃষ্টি নেই। তাই দেখতে পাই, যখন আবর্জ্জনা এসে এই জীবন পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছে, তখন সে স্তূপ অটল হয়েই গেছে, তাকে স্রোতের মুখে ভাসিয়ে দেবার শক্তি এ জীবন-নদীর জলে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেনি। তাই বুঝি ভারতের জীবন-ধারা নদী হয়ে বয়ে না গিয়ে ক্রমশঃ নানা আবর্জ্জনার বাঁধে বাঁধা পড়ে এখন যেন শেওলা পানা ঢাকা পুকুর হয়ে পড়েছে। বিশ্ব-সাগরের দিকে প্রাণনদী ছোটেনি বলেই বোধ হয় এই দুর্দ্দশা। আমরা চির দিনই নিজেদের নিয়ে গণ্ডী কেটে ঘরের কোণে বসে থাক্‌তে ভালবাসি বলেই জীবনের চঞ্চলতা আমাদের প্রাণে কোন মোহ জাগায়নি। সবই মিথ্যা সবই মায়া বলে আমাদের জীবন যেন জন্মাবধি মরণের দিকেই মুখ করে বসে আছে।

এক একবার দেখ্‌তে পাই, বিশ্বমায়ের এই শান্ত শিশু ভারতবর্ষ যেন দুর্দ্দান্ত অশান্ত হয়ে উঠেছে। কারণ খুঁজলেই দেখি, সেথা বিদেশ ও বিদেশীর সংস্পর্শে এসে হয়েছে। মোগলদের সময়কার শিখ ও মহারাষ্ট্র জাতির উত্থানের কথা, এই অশান্তির মধ্য দিয়ে ফুটে উঠ্‌বার চেষ্টার সাক্ষ্য দিচ্ছে। এখন যে আমরা কিছু কিছু অধীর হয়ে পড়েছি, সুবোধ বালকের জীবন যে অনেকের কাছেই আর বাঞ্ছনীয় নয় বলে মনে হচ্ছে, এ ভাব ও আমাদের মধ্যে বিদেশ থেকে এসেছে। বিদেশের ঝড়ো হাওয়া আমাদের ঘুমের চাদর খানা উড়িয়ে ফেলে দিচ্ছে। আমি তাই বিদেশের এনে দেওয়া এই অশান্তির উপর রাগ না করে মনে মনে তাকে প্রণাম করি। অশান্তির ভিতর দিয়েই জীবনের অনুভূতি বিকশিত হয়ে উঠ্‌বে, নির্জ্জীব শান্তির মধ্যে নয়।

জীবনের অনুভূতি আমাদের মধ্যে নেই বললেও হয়। বেঁচে থাকার যে আনন্দ, আমরা ক'জন তা অনুভব করি? এখানে Browningএর একটা কবিতা না তুলে পারলাম না :—

> Oh, our manhood's prime vigour!
> no spirit feels waste,
> Not a muscle is stopped in its playing,
> nor sinew unbraced.
> Oh, the wild joys of living! the
> leaping from rock to rock—
> The strong rending of boughs from
> the fir tree,—the cool silver shock
> Of the plunge in a pool's living water,
> —the hunt of the bear,
> And the sultriness showing the lion is
> couched in his lair.
> And the meal—the rich dates yellowed over
> with gold-dust divine,
> And the locust's-flesh steeped in the pitcher.
> the full draught of wine,
> And the sleep in the dried river-channel
> where bulrushes tell
> That the water was wont to go warbling
> so softly and well
> How good is man's life, the mere living!
> how fit to employ
> All the heart and the soul and the senses,
> for ever in joy!

আমাদের অধ্যাত্মবাদীরা হয়ত বলবেন যে the mere livingএর মধ্যে যে এত আনন্দ এটা পাশ্চাত্য জগতের জড় বাদীদেরই সাজে। কিন্তু এই কবিতা পড়তে পড়তে তার প্রতি ছত্রে যে অপরূপ জীবনের ছবি ফুটে ওঠে, তা কি আমাদের রক্তকে আনন্দে চঞ্চল করে তোলে না? জীবনের অতি সামান্য অনুষ্ঠান গুলি—ওঠা, বসা, ছোটা, শোওয়া, খাওয়া,—সবই যেন আনন্দে আর বাঁচবার জন্য ব্যগ্রতায় পরিপূর্ণ। এমন করে কেন আমরা অনুভব করব না? আমরা কেন অন্ধকারে চোখ বুঁজে পেঁচার দর্শন শাস্ত্র আলোচনা করব?

কথাবার্তা গল্প গুজবের মধ্যেও আমাদের প্রাণহীনতা যেন পদে পদে ধরা পড়ে। বাজে গল্প ত বাজেই কিন্তু আমাদের গুরু গম্ভীর সার ও কাজের কথার মধ্যেও যে সবটা অনেক

সময় বাজে হয়ে পড়ে না, তা জোর করে বলতে পারি না। কেবল সার করতে গিয়ে, অসারকে বাদ দিতে গিয়ে, প্রাণের খেলা বন্ধ করে সবটাই দুর্ব্বোধ্য দুষ্পাচ্য করে তুলি। একবার একটা পাড়াগাঁর মতন জায়গায়ও সেখানকার কয়েকজন ইউরোপীয় বাসিন্দা নানারকম আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা রেখেছিলেন বলে একজন বিজ্ঞ দার্শনিক মাথা নেড়ে বললেন - বেটাদের আমোদ ছাড়া কিছু নেই। যেখানে ওদের অন্ততঃ দুটোও এক হবে, সেখানেই যত বাজে আড্ডার ব্যবস্থা করে ছাড়বে—তিনি ভুলে গিয়েছিলেন যে তাদের প্রাণ জিনিষটা প্রচুর পরিমাণে আছে বলেই সেটার বাজে খরচ তারা করতে পারে, আমাদের মত নাকেমুখে ছিপি এঁটে থাকতে হয় না।

জাতিগত জীবনে এই প্রাণহীনতা কতখানি অনিষ্টকর, তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমরা নিজেরাই। তাই যে দিকে তাকাই, দেখি নিরাশায় নিষ্প্রভ মুখ, আর শুনি কেবল কান্না। এই কাঁদুনি গান আমাদের একেবারে মেরে রেখেছে। সাহিত্যে ও চিত্রকলায় ও অনেক সময় আমাদের এই কান্নার রূপ ধরা পড়ে। কান্না জিনিষটা মিথ্যা নয়, কিন্তু কেবলই কান্না মানুষকে বিশেষতঃ আমাদের মত দুঃখভারে অবনত জাতিকে - বড় অবসাদগ্রস্ত করে তোলে, আমাদের দুঃখ-ব্যথা, আমাদের পতিত অবস্থার কাহিনী, এসব কেঁদে গাইলে চলবে না ত, এ সব আগুনের অক্ষরে বুকে দেগে দিতে হবে, অশান্তির ছন্দে গেঁথে সে কাহিনী শুনিয়ে সবাইকে অশান্ত করে তুল্‌তে হবে, কর্ম্মের তালে জীবনের গান বেঁধে নিয়ে চল্‌তে হবে রুদ্ধ কান্নায় মুখ গুঁজে পড়ে থাকলে চল্‌বে না।

দুঃখকে অনেকে অস্বীকার করেন দেখেছি। সেটার মানে আমি ঠিক্ বুঝে উঠ্‌তে পারি না। জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তে যে দুঃখের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হয়, এ ত মিথ্যা হতে পারে না, মন গড়া হতে পারে না। থাক্ না দুঃখ সেটা নেই বল্‌লেই কি চুকে গেল? দুঃখকে অস্বীকার করবার কোন কারণ ত দেখতে পাই না। দুঃখের মধ্যে দিয়ে সত্যকে লাভ করা, দুঃখকে এড়িয়ে নয়। দুঃখ সাগরের বুক ছেঁচে তবে ত আনন্দ মাণিক পাওয়া গেছে। কেন তবে দুঃখকে ভুল্‌ব? কেন তাকে অস্বীকার করব? সে যে আমার বড় আপন, সে যে আমার মর্ম্মে মর্ম্মে গাঁথা, সে যে আমার রক্তের প্রতি বিন্দুতে মিশিয়ে গেছে। যে যাই বলুক আমি বল্‌ব যে, আমার কান্না, আমার হাহাকার, আমার বেদনা, এ সব সত্য,—ভগবান যেমন সত্য। এগুলো মায়া নয়, মোহ নয়। কান্নার মধ্যেই যে হাসির ইন্দ্রধনুর রূপ ফুটবে ভাল। কিন্তু এই কান্নার মধ্যেও আমি চাই অশান্তি, আমি চাই ঝড়, আমি চাই হাহাকারে ঘরের কোণ ছেড়ে বিশ্বের মুক্ত প্রান্তরে বেরিয়ে পড়া। আমাদের শরীরের প্রতি অণুতে অণুতে যে জীবনের চঞ্চলতা আছে, সেটা নিজে অনুভব করা, আর অন্যকে বুঝিয়ে দেওয়া, এই যেন পারি।

দুঃখকে অস্বীকার করা যায় না, তা বুঝলাম, কিন্তু দুঃখ-জয়ী হতে পারা যায় কেমন করে? যুগে যুগে মহাত্মারা দুঃখ নির্ব্বাণের পথ খুঁজেছেন। কিন্তু এক জনের কাছে যা ঠিক বলে হয়েছে, তা হয়ত সবাই মন দিয়ে গ্রহণ করতে পারে নি। তাই এর পথ বলে দেওয়া বড় কেবে শক্ত।

তবে মনে হয় যে দুঃখের মধ্য দিয়ে গিয়েই সবাই দুঃখ জয়ী হতে পেরেছেন। জীবনের গতির দিক্ দিয়ে দেখ্‌লে বোধ হয় যে, নিভৃত গুহায় নির্জ্জনে যোগাসনে বসে দুঃখ নির্ব্বাণের সাধনা না করে জীবনের সব শোকতাপের ভিতর দিয়ে, সব বাধা বিঘ্ন প্রলোভনের মধ্যখান দিয়ে চলে যে দুঃখ জয়ের আনন্দ, সেইটাই অতি উপভোগ্য। সকলের মতে তা না হ'তে পারে। কিন্তু আমি যখন দেখি যে একজন নিজের স্বার্থপরতার প্রাচীরে ঘিরে নিজেকে বাঁচিয়ে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে ব্যগ্র, আবার অন্য দিকে দেখি যে একজন নিজের মোক্ষলাভ ভুলে দশ জনের সঙ্গে কর্ম্মজগতে ছুটে চলেছে, শতবার উঠা পড়ায় তার দেহমন ক্ষতবিক্ষত, সংসারের অনেক ধূলা তার গায়ে মাখান, তবু সে তার কল্যাণ হাত দুটি বাড়িয়ে রেখেছে তার আরও সব ধূলা-কাদা মাখা ভাই বোন গুলিকে বুকে টেনে নেবার জন্য, তখন ঐ নির্ব্বিকার যোগীকে ছেড়ে, এই শত শ্রান্তিপূর্ণ মহৎপ্রাণ কর্ম্মীর ধূলা মাখা পায়েই আমার মাথা লুটিয়ে পড়তে চায়, কেন না তাঁর পায়ের ধূলা প্রমাণ দেয় যে তিনি তাঁর মাটির পৃথিবীর ভাই বোনদের সঙ্গে সমানে পথ হেঁটেছেন, অলসের মত লুকিয়ে একা নিজের উদ্ধারের পথ আবিস্কার করতে ব্যস্ত হন নি, তাঁর ব্যথা ক্ষত দেহটি প্রমাণ দেয় যে তিনি ছুটতে গিয়ে অনেক বার পড়েছেন, আর পড়েছেন বলেই আবার উঠে অনেক পতিতকে সঙ্গে তুলে নিতে পেরেছেন, বীরমন্ত্রে দীক্ষা তাঁর সার্থক হয়েছে!

যে নিজে যেটা অনুভব না করে, সে যেমন অন্যকে সে বিষয় বোঝাতে পারে না, তেমনই যার নিজের জীবন জীবন্ত নয়, সেও অন্যকে জাগিয়ে তুল্‌তে পাবে না। আমরা কত বক্তৃতা করি, কত লোকের সঙ্গে মিশি, কিন্তু কৈ, ক'জনের প্রাণে আগুন জ্বালতে পারি? আমার জীবন প্রদীপের শিখাটিতে আলো না জ্বাল্‌লে সেখান থেকে অন্যে তার প্রদীপ-শিখাটিতে আলো জ্বালাবে কেমন করে? আমাদের মধ্যে চাই প্রাণ-স্পন্দন। যে কাছে আসবে, সে যেন জীবন্ত আত্মার সংস্পর্শে এসে একেবারে জাগ্রত জীবন্ত হয়ে ওঠে। প্রত্যেক কথায় প্রত্যেক কাজে চাই প্রাণ। এই প্রাণ স্পন্দনে যখন আমাদের জীবন স্পন্দিত হয়ে উঠবে, তখনই আমরা দুঃখজয়ী বীর হতে পারব। তখনই আমাদের জীবন জীবন্ত আনন্দে পূর্ণ হয়ে উঠবে। রুদ্রের আঘাত যতই প্রবল হোক্, তখন আমরা দুঃখকে অস্বীকার না করেও বল্‌তে পারব—

> দুঃখখানি দিলে মোর তপ্তভালে থুয়ে,
> অশ্রুজলে তারে ধুয়ে ধুয়ে
> আনন্দ করিয়া তারে ফিরায়ে আনিয়া দিই হাতে।

শ্রীসুনীতিদেবী।

# বনপর্ব্ব।

## প্রথম অধ্যায়।

### ভারতের তপোবন।

সুবিশাল কুরুক্ষেত্র প্রান্তরের এক প্রান্ত দেশ দিয়া ক্ষুদ্রা সরস্বতী নদী প্রবাহিত হইতেছে। শুভ্র সৈকতে শরীর ঢাকিয়া ধীরে ধীরে নীরবে, যেন সলজ্জভাবে চলিয়া যাইতেছে। সমীরণ কত চেষ্টা করিতেছে, তথাপি দরিদ্রের হৃদয়ে উচ্চ আশার ন্যায়, তাহার চক্ষে তরঙ্গ তুলিতে পারিতেছে না। নদী তীরেই কাম্যক তপোবন, বন ও উপবনের সুন্দর সম্মিলন। তথায় কত বন্য বৃক্ষের সহিত একতায় কত পুষ্পবৃক্ষ, কত ফলবৃক্ষ শোভা পাইতেছে। গাছে গাছে কত ফল ধরিয়া রহিয়াছে, কত ফুল ফুটিয়া আছে। কুসুমগন্ধে তপোবন আমোদিত হইতেছে। পুষ্প পল্লব ভারে অবনত কত লতা বৃক্ষের গলায় মালাকারে ঝুলিতেছে, আর বায়ু ভরে দুলিতেছে। বসন্তের সহিত প্রকৃতির পরিণয়ে পাদপ সকল উত্তম বেশ ভূষা করিয়া যেন বিবাহের বরযাত্রী সাজিয়াছে। কোথাও আবার প্রকৃতি সুন্দরী পুষ্প পল্লব শোভিত, লতাগুল্ম জড়িত মনোহর নিকুঞ্জ করিয়া তাহার মধ্যে বসন্তকে লইয়া বসিয়া হাসিতেছে। তাহা দেখিয়া বিহগকুল আনন্দে বিভোর হইয়া উড়িতেছে, বসিতেছে আর শুভাশীর্ব্বাদ দিতেছে। ঘুঘু, কোকিল, পাপিয়া প্রভৃতি এ উৎসবে যোগদান করিয়াছে। অপরের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া ক্রমোচ্চ স্বরে এই শুভসংবাদ সুদূরে বহন করিতেছে। মক্ষিকাকুল আকুল হইয়া গুণ গুণ স্বরে বিবাহ-গীতি গাইতেছে। ময়ূর ময়ূরীগণ আনন্দে নৃত্য করিয়া ফিরিতেছে। কোথাও আনন্দোৎফুল্ল মুনিকন্যাগণের হাত হইতেই খাদ্য খাইতেছে। মৃগসকল নির্ভয়ে বিচরণ করিতেছে। কোথাও মুনিপত্নীগণকে দেখিয়া দৌড়িয়া আসিতেছে তাঁহারা ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া তাহাদের গায় হাত বুলাইয়া চলিয়া যাইতেছেন। আর তাহারা নাচিতে নাচিতে তাঁহাদের পাছে পাছে ছুটিতেছে। কোথাও মৃগশিশু মুনিপত্নীর ক্রোড়ে সন্তান দেখিয়া ছুটিয়া আসিতেছে, মস্তক দ্বারা তাঁহার পায় ঘর্ষণ করিতেছে, কোলে উঠিবার জন্য আবদার করিতেছে। তপস্বিনী হাসিয়া স্বীয় সন্তান নামাইয়া দিতেছেন, আর মৃগশিশুকে ক্রোড়ে লইতেছেন, মুখ চুম্বন করিতেছেন। আর সেই বালক? সে হাসিয়া দুই হাত তুলিয়া সাগ্রহে বলিতেছে, "মা, আমায় কোলে দাও, আমায় কোলে দাও।"

এই কাম্যক তপোবনে নদীর অদূরে পর্ণকুটীর শ্রেণী—কত মুনির কত আশ্রম। এখানে কত ঋষি স্ত্রী পুত্র পরিবার লইয়া বাস করিতেছেন। সেই বনজাত ফল ও মূল, অনায়াস জাত নিবার ধান্যের চাউল, গৃহ পালিত গাভীর গৃহজাত বিশুদ্ধ অপর্য্যাপ্ত দধি দুগ্ধ ঘৃত, ক্ষীর সর নবনী আর বহুবিধ মাংস তাহাদের শরীরের পুষ্টি সাধন করিতেছে। পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ ও মুনিঋষিগণ বহুপ্রকার মাংস ভক্ষণ করিতেন। মোটা কার্পাসবস্ত্র, বৃক্ষের ছাল ও চর্ম্ম ঋষিগণের পরিধেয়। তাঁহারা ব্রহ্মমুহূর্ত্তে জাগরিত হন, ব্রহ্মনাম কীর্ত্তনে তপোবন পবিত্র করেন। পরে সরস্বতী নদীতে প্রাতঃস্নান করিয়া আসিয়া যজ্ঞে প্রবৃত্ত হন, সমস্বরে সামগান করিয়া তপোবন মুখরিত করিয়া তুলেন। অনন্তর কোন মুনি কোন বৃহৎ বৃক্ষের ছায়াতলে

কুশাসনে বসিয়া নূতন ছাত্র ও ছাত্রীগণকে অধ্যয়ন করান। কেহ অন্য বৃক্ষ বেদীকায় অপরের সহিত তর্ক বিতর্কে প্রবৃত্ত হন। কেহ আবার নির্জ্জনে বসিয়া নূতন গ্রন্থ রচনা করিয়া ভারতে নূতন চিন্তার স্রোত প্রবাহিত করেন। যে সংস্কৃত গ্রন্থ-রত্ন রাশী আজ জগতের বিস্ময় উদ্দীপন করিতেছে, তাহা এই তপোবনেই রচিত হইয়াছিল, এই তপস্বীগণই রচনা করিয়াছিলেন। কেহ আবার দূরদেশে পর্যাটন করিয়া তথাকার জ্ঞান স্বদেশে আনিয়া সকলের মধ্যে বিতরণ করেন। সকলে সকল শুনিয়া বিস্মিত ও আনন্দিত হন। এই তপস্বীগণ বিভিন্ন মতাবলম্বী, তথাপি একই তপোবনে সকলে সুখে ও সৌহার্দ্দে বাস করিতেছেন কাহারও সহিত কাহারও বিরোধ নাই। মতাপার্থক্য সৌহার্দ্দ্যের অন্তরায় হয় নাই। তাঁহারা সর্ব্বপ্রকার বিরোধ ও বিলাসিতা বর্জ্জন করিয়া, স্বেচ্ছায় দারিদ্য ব্রত গ্রহণ করিয়া, কেবল জ্ঞান ও ধর্ম্মের অনুশীলনে জীবন যাপন করিতেছেন। পরোপকার দেশোপকার ভিন্ন তাঁহাদের আর কোন লক্ষ্য নাই। প্রবল নরপতিগণ পর্য্যন্ত প্রজাপীড়ন করিলে, অন্যায় অত্যাচার করিলে, এই নিঃস্বার্থপর তপস্বীরা তাঁহাদের সভায় গিয়া তাঁহাদিগকে তিরস্কার করেন, ন্যায়ের অনুসারে রাজ্যশাসন করিতে উপদেশ দেন কত রাজা ও রাণী আবার কত সময় এই সকল তপোবনে গিয়া শান্তিসুখ উপভোগ করেন, এই অগাধ জ্ঞানান্বিত মুনিগণের সহিত রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি সম্বন্ধেও পরামর্শ করেন। ভারতবর্ষ চিরদিনই ত্যাগের দেশ। এই মুনি ঋষিরা ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া, বিলাসিতা বর্জ্জন করিয়া, দিনরাত কেবল জ্ঞান আহরণে ও বিতরণে নিযুক্ত, দেশোপকারে আত্মোৎসর্গীকৃত, কেন না সমস্ত দেশ, সমুদয় রাজা ও রাণী তাঁহাদের পদতলে মস্তক অবনত করিবে? এইরূপ জ্ঞান কর্ম্ম ও ধর্ম্মময় জীবন, মহাত্যাগী মহর্ষিগণ সমাজের শীর্ষদেশে আছেন বলিয়াই সমাজ এমন সুন্দর ভাবে চলিতেছে, দেশ এত উন্নত হইতেছে।

তাঁহারা বহু ছাত্র ও ছাত্রীগণকে নিজের নিকটে রাখেন, দীর্ঘ দ্বাদশ বর্ষ অন্ন বস্ত্রাদি দ্বারা প্রতিপালন করিয়া অধ্যয়ন করান। আর বিবিধ সদুপদেশ দিয়া, ততোধিক স্বীয় আদর্শ চরিত্র দ্বারা মহাসঙ্কটময় যৌবনে সংযমী হইতে সহায়তা করেন। এই ছাত্র ও ছাত্রীগণ গুরুদেবের সহিত একত্র বাস করিয়া তাঁহার আদেশে অনুপ্রাণিত হইয়া, এমন জিতেন্দ্রিয় হয় যে শেষে সংসারের কোন প্রলোভনই তাহাদিগকে বিচলিত করিতে পারে না। মহর্ষিরা যে একমাত্র ব্রাহ্মণ-তনয়কেই নিজের নিকট রাখিয়া অধ্যয়ন করান, তাহা নহে। শূদ্র বালকও পড়িতে চাহিলে তাহাকেও পুত্র নির্ব্বিশেষে লালন পালন করেন ও বেদাদি সকলই অধ্যয়ন করান *। আবার রমণীগণকেও শিক্ষা দেন। বিদুষী আত্রেয়ী প্রথমে বাল্মীকির নিকট, পরে মহর্ষি অগস্ত্যের নিকট শিক্ষা লাভ করেন, রমণীরত্ন গার্গী ব্রহ্মবিদ্যার পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে স্ত্রী স্বাধীনতা ছিল, স্ত্রী জাতির সম্মান ছিল, জ্ঞানের দ্বার সকলের জন্যই উন্মুক্ত ছিল। সাধে কি ভারতবর্ষ জগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল?

তখনকার ছাত্রজীবন বর্ত্তমানের বিলাস সর্ব্বস্ব ছাত্রজীবনের আদর্শ। তপোবনের ছাত্র গণের মাথায় জটা, পরিধানে ক্ষুদ্র ও মোটা কাষায় বস্ত্র। শরীর তৈল হীন। কোথাও তাহারা

* এ সম্বন্ধে এই গ্রন্থের শান্তিপর্ব্বের ৫ অধ্যায়ে 'মাংস' দ্রষ্টব্য।

মুনির ধেনু চরাইতেছে, কোথাও তাঁহার জমির আইল বাঁধিতেছে, কোথাও তাঁহার শস্য রোপন করিতেছে। কোন ছাত্র বনে গিয়া কুড়ালী দিয়া কাঠ কাটিতেছে, কেহ তাহা মস্তকে করিয়া দূরবর্ত্তী আশ্রমে চলিয়াছে *। কেহ কাঠ আনিতে দূরবর্ত্তী গভীর বনে প্রবেশ করিয়া প্রবল ঝড়বৃষ্টিতে আক্রান্ত হইয়া অন্ধকার রজনী হিংস্রপশুময় সেই বনেই অতি-বাহিত করিতেছে। কোন ছাত্র পর্ণকুটীর পরিষ্কার করিতেছে, কেহ হোমের অগ্নি জ্বালিতেছে, কেহ বন হইতে ফলমূল ও কুশের ভার মস্তকে করিয়া আনিতেছে। তাহারা মহর্ষিগণের সর্ব্বপ্রকার কার্য্য করিতেছে। কোন কর্ম্মকেই নীচকর্ম্ম, অপমানের কর্ম্ম বলিয়া মনে করিতেছে না। তাহাতে একদিকে তাহাদের শরীর দৃঢ় পুষ্ট ও বলিষ্ঠ হইতেছে, পরিশ্রম করিবার শক্তি বৃদ্ধি হইতেছে, তাহারা সর্ব্বপ্রকার কর্ম্ম করিতে অভ্যস্ত হইতেছে, শীত গ্রীষ্ম সহ্য করিতে পারিতেছে; অন্য দিকে তাহাদের মনের উন্নতি হইতেছে, অহঙ্কার দূরে যাইতেছে, বিনয়ী হইতেছে, 'কর্ম্মই ঈশ্বর' ইহা বুঝিতেছে। এইরূপ কঠোর জীবন যাপন করে বলিয়া তাহারা আনন্দবিহীন নহে। তাহারা সদানন্দ পুরুষ। তাহারা ঘোর সংযমী, মহাত্যাগী সকলেই ব্রহ্মচারী। পূর্ব্বে দ্বাদশবর্ষ ব্যাপিয়া গুরুর নিকট থাকিয়া সংযম শিক্ষা করিতে হইত। অধ্যয়ন শেষে ব্রহ্মচর্য্য সমাপ্ত হইত। তখন বিবাহ করিয়া গৃহস্থ আশ্রমে প্রবেশের নিয়ম ছিল। তপোবনের ছাত্রগণ কিরূপ সংযমী ছিল, তাহা কচ ও দেবযানীর মনোহর গল্পে জানা যায়।

সুরগণের সহিত অসুরগণের চিরবিবাদ, চিরদিন ঘোর যুদ্ধ। সুরগুরু বৃহস্পতি ও অসুরগুরু শুক্রাচার্য্য স্ব স্ব পক্ষ পরিচালন করিতেছেন। উভয়ের মধ্যে ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুক্রাচার্য্য মৃতকেও জীবিত করিতে জানেন। বৃহস্পতি তাহা জানেন না। তিনি তাহা শিখিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন। কিরূপে শিখিবেন? শেষে অনেক ভাবিয়া স্বীয়পুত্র কচকে শুক্রাচার্য্যের নিকট পাঠাইলেন। কচ শুক্রাচার্য্যের শিষ্য হইতে চাহিলেন। আচার্য্য বলিলেন, "সেত উত্তম কথা। তাহাকে তোমার পিতার উপরে আমার শ্রদ্ধা দেখান হইবে।" আচার্য্য তাঁহাকে নিজের আশ্রমে, নিজের নিকট রাখিয়া অধ্যয়ন করাইতে লাগিলেন।

দেবযানী নামে শুক্রাচার্য্যের এক অপূর্ব্ব লাবণ্যময়ী যুবতী কন্যা ছিল। কচও অতি সুন্দর যুবা পুরুষ। তিনি নিয়মিত সময়ে অধ্যয়ন করেন, আর অন্য সময়ে আশ্রমের যাবতীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। তিনি দয়া, সাধুতা, মধুর ব্যবহার ও সংযম দ্বারা দেবযানীকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। বন হইতে সুন্দর ও সুগন্ধ পুষ্প, সুপক্ক ও সুমিষ্ট ফল আনয়ন করিয়া দেব-যানীর হস্তে দেন। অবসর সময়ে নৃত্যগীতবাদ্য দ্বারা তাঁহাকে মোহিত করেন। দেবযানীও গীত ও মধুর ব্যবহার দ্বারা কচকে পরিতুষ্ট করিতে লাগিলেন †। পূর্ব্বে হিন্দু সমাজে নৃত্যগীতবাদ্য নিন্দনীয় ছিল না ‡।

---

* আদিপর্ব্ব ৭০ অধ্যায়।

† আদিপর্ব্ব ৭৬—২৪—২৫—২৬।

‡ এসম্বন্ধে এই গ্রন্থের শান্তি পর্ব্বের ৩য় অধ্যায়ে 'কলাবিদ্যা' দ্রষ্টব্য।

একদিন সন্ধ্যা হইয়াছে, কচ মস্তকে কুশ ও কাঠের বোঝা লইয়া আচার্য্যের গাভীসহ বন হইতে আশ্রমে আসিতেছেন। অসুরগণ তাঁহাকে বৃহস্পতির পুত্র বলিয়া জানিতে পারিয়া খুব প্রহার করিল ও মৃতপ্রায় করিয়া রাখিয়া গেল। মুনির গাভী যখন গৃহে আসিল কচ আসিলেন না। তাহাতে দেবযানী অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া পিতার নিকট গমন করিলেন, বলিলেন, "বাবা, গাভী সকল আসিয়াছে, কচ আসে নাই। নিশ্চয়ই কেহ তাহাকে নিহত করিয়াছে। কচ বিনা আমি জীবন ধারণ করিতে পারিব না।" মুনি তাহা শুনিয়া বনে গমন করিলেন। কচকে সঞ্জীবিত করিয়া লইয়া আসিলেন। আর একদিন অসুরগণ কচের ততোধিক দুর্দ্দশা করিল। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইল, তথাপি কচ আসিলেন না। তখন দেবযানী ব্যথিত হৃদয়ে পিতাকে বলিলেন, "বাবা, নিশ্চয়ই কচের কোন বিপদ হইয়াছে। তাহার কোন বিপদ হইয়াছে। তাহার কোন বিপদ হইয়া থাকিলে, আমিও প্রাণত্যাগ করিব।" এই বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। শুক্রাচার্য্য বলিলেন, "দেবযানি, তোমার ন্যায় রমণীর কোন নশ্বর ব্যক্তির জন্য শোক করা উচিত নহে।" কন্যা উত্তর করিলেন, "বৃদ্ধ অঙ্গিরা ঋষি যাঁহার পিতামহ, তপোধন বৃহস্পতি যাঁহার পিতা, কর্ম্মে যিনি সতত উৎসাহশীল ও দক্ষ, এইরূপ ব্রহ্মচারী তপোনিধির জন্য কেন আমি শোক করিব না? কেনই বা রোদন করিব না? আমি আর আহার করিব না। কচ যে পথে গিয়াছে, আমিও সেই পথে যাইব।" শুক্রাচার্য্য বলিলেন, "তনয়ে, তুমিও কচকে ভালবাস, সেও তোমাকে ভাল বাসে। কিন্তু তাহার উপকার করিতে গিয়া যদি আমার বিপদ ঘটে, তাহা হইলে তুমি কি করিবে?" দেবযানী উত্তর করিলেন, "বাবা, আপনার বিপদ হইলেও জীবিত থাকিতে পারিব না। অগ্নি তুল্য যে কোন শোকেই দগ্ধ হইব।" তখন শুক্রাচার্য্য কচকে আবার জীবিত করিলেন: দেবযানীর আনন্দের অবধি রহিল না।

ক্রমে কচ শুক্রাচার্য্যের নিকট মৃতসঞ্জীবনী প্রভৃতি সমুদয় বিদ্যা শিখিলেন। পরে পিতার নিকট গমন করিবার জন্য তাঁহার নিকট বিদায় লইলেন। এখন দেবযানীর নিকট বিদায় লইতে উপস্থিত হইলেন।

দেবযানী। কচ, আমি তোমায় কত ভালবাসি, তাহা কি তুমি জান?

কচ। দেবযানি, আমি তোমায় কত ভালবাসি, তাহা কি তুমি জান?

দেবযানী। তবে তোমার ব্রত শেষ হইয়াছে, ব্রহ্মচর্য্য হইতে নিবৃত্ত হইয়াছ, এখন আমায় বিবাহ কর।

কচ। দেবযানি, তুমি আমার গুরুর কন্যা, সহোদরা তুল্যা। তোমায় সহোদরার ন্যায় ভাল বাসিয়াছি। বিবাহের প্রস্তাব করা তোমার উচিত নহে।

দেবযানী। কেন? তুমি ত আমার পিতার পুত্র নহ, বিবাহ করায় দোষ কি? আমি ত কোন অন্যায় কার্য্য করি নাই, কোন অপরাধও করি নাই। তবে কেন আমাকে পরিত্যাগ করিবে? এই বলিয়া দেবযানী অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

---

* এ সম্বন্ধে এই গ্রন্থের শান্তিপর্ব্বে ৫ম অধ্যায়ে 'জন শিক্ষা' দ্রষ্টব্য।

† এ সম্বন্ধে এই গ্রন্থের শান্তিপর্ব্বে ৫ম অধ্যায়ে 'নারীজাতি,' 'অবরোধ প্রথা' ও 'স্ত্রী-শিক্ষা' দ্রষ্টব্য।

‡ আদিপর্ব্ব ৩ অধ্যায়।

§ শ্রীমদ্ভাগবত ১০—৮০—৩৪ সাং ৩৯। ইহা কৃষ্ণের নিজজীবনের ঘটনা।

কচ। ভগিনি, তুমি কোন অপরাধ কর নাই, কোন দোষও কর নাই। তুমি রূপগুণে-শ্বরী, তাহা আমি জানি। তুমি আমাকে অত্যন্ত ভালবাস, তাহাও জানি। আমি তোমার নিকটে পরম সুখে ছিলাম। কোনদিন কোনরূপ মনে কষ্ট পাই নাই। তুমি আমার গুরুর কন্যা, কেবল এইজন্যই বিবাহ করিতে অসম্মত হইতেছি। তুমি আমাকে যেরূপ সহোদরের ন্যায় এতদিন ভাল বাসিয়াছ, এখনও সেইরূপ ভাল বাসিও, আর অবসর সময়ে আমার কথা মনে করিও। আমি চলিয়া গেলে আমার গুরুদেবের যেন কোন কষ্ট না হয়, তাহা দেখিও। প্রিয় ভগিনি, এখন বিদায় দাও, পিতার নিকট গমন করি।

দেবযানী অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। তথাপি কচ বিচলিত হইলেন না। মুনি কন্যা-গণের স্বভাব কিরূপ সরল ও স্বাভাবিক ছিল, তাহাও এই গল্পে জানা যায়।

পাণ্ডবগণ ও দ্রৌপদী স্বদেশ, স্বরাজ্য, ইন্দ্রপ্রস্থের অতুল ঐশ্বর্য্য অতল জলে বিসর্জ্জন দিয়া দীন হীন বেশে কাম্যক বনে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের পুত্রগণ ইন্দ্রপ্রস্থ হইতেই স্ব স্ব মাতুলালয়ে গমন করিলেন। তাঁহাদের রাজ্য, রাজধানী ও ঐশ্বর্য্য সকলই দুর্য্যোধন অধিকার করিয়া বসিলেন। পাণ্ডবেরা কাম্যক তপোবন দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। এখানেই পর্ণ কুটীর বাঁধিয়া বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহারা মৃগয়া করেন, আর দ্রৌপদী সেই মাংস ও নিবার ধান্যের চাউল প্রস্তুত করিয়া অন্নব্যঞ্জন রন্ধন করেন। অগ্রে ব্রাহ্মণ ও স্বামীগণকে আহার করাইয়া পরে নিজে ভোজন করেন*। মধ্যে মধ্যে মুনি ও মুনিপত্নীগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া আহার করান। পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য পরস্পরের অন্ন ভোজন করিতেন। তাঁহারা কোন কোন স্থলে শূদ্রের অন্নও ভক্ষণ করিতেন। পঞ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদীর সৌজন্য ও সদ্ব্যব-হারে সেই তপোবনের সকলেই মুগ্ধ হইলেন। সেই তপোবনের সুখ ও শান্তি, শোভা ও সম্পদ্ দেখিয়া অনেক সময় তাঁহাদের মনে হইতে লাগিল, ধনৈশ্বর্য্যের সুখ অপেক্ষা এই তপো-বনের শান্তি সুখ কি স্পৃহনীয় নহে?

এইরূপ কত তপোবন একদিন ভারতবক্ষে বিরাজ করিত। সে সকলই চিরদিনের জন্য অদৃশ্য হইয়াছে। মহাজ্ঞানী, মহাত্যাগী, মহাকর্ম্মী মহর্ষিগণও চিরদিনের জন্য ভারতবর্ষ হইতে চলিয়া গিয়াছেন। সে দিন হইতে ভারত সন্তান এই মুনিঋষিদের ন্যায় সাধারণভাবে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ ও উচ্চচিন্তা ও দেশহিত সাধনে জীবন উৎসর্গ করিতে বিরত হইয়াছে, সেই দিন হইতে ভারত অধঃপতিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। জানিনা কবে তাহার বিরাম হইবে!

---

## মায়া।

স্পর্শ মোরে রসের নেশায় অধীর করে।  
হয়ত সুধা নয়ত গরল,  
ঢেউ খেলে যায় শুধু তরল;  
ঢেউএর গানের মৃদুল তানে বধির করে।  
ফুলের দলের দোলে জাগা,  
ছায়ার তলে আলস-লাগা  
বাতাস আসে ভেসে ভেসে গন্ধ ভরে।  
ফুটে উঠে রূপের মায়া;  
নয় সে আলো নয় সে ছায়া;  
চমক্ ভরে চাইয়ে মোরে অন্ধ করে।

শ্রীবিজয় চন্দ্র মজুমদার।

---

* বনপর্ব্ব ৫০—১০। এ সম্বন্ধে এই গ্রন্থের শান্তিপর্ব্বের যে অধ্যায়ে 'অন্ন' ও 'পানীয়' দ্রষ্টব্য।

# তক্ষশিলা-তত্ত্ব—বন্ধুর পত্রে।

রাওয়ালপিণ্ডী
১০।১০।১৯২০

ম—

তোমাকে কিছু বলিয়া সুখ নাই। বিনা বিচারে বন্ধুবাক্য বিশ্বাস করা তোমার ধাতে নাই। বন্ধুদের কথামত কাজ ত করিবেই না। ভাগ্যি, সামান্য কিছু প্রজ্ঞা ভগবান্ তোমাকে দিয়াছিলেন, নতুবা তোমার যে কি দশা হইত ভাবিয়া দেখ। শাস্ত্রে আছে— "যস্য নাস্তি স্বয়ং প্রজ্ঞা মিত্রোক্তং ন করোতি যঃ। স এব নিধনং যাতি যথা মন্থরঃ কৌলিকঃ॥" ও সামান্য প্রজ্ঞায় তোমাকে বেশী দিন সাম্‌লাইতে পারিবে না। এখনও সময় আছে সাবধান।

মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন দেশের ছেলে মেয়েরা ভারতের সরকার-সংসৃষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িতে পারিবে না। ঐসব বিশ্ববিদ্যালয়ে হয় য়ুরোপ হইতে, নয় চীনদেশ হইতে ছাত্রেরা আসিয়া পড়িবে। আর তাও যদি কলিকাতার "শুঁফো সরস্বতী"র অদৃষ্টে না থাকে— তবে "দরোয়াজা বন্ধ"! বন্ধুবান্ধবদের ছেলেপিলের পড়া বন্ধ হইয়া যায়। স্বদেশ সেবক নন্দলাল করেন কি? নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। দেশের জন্য, দশের জন্য, প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে প্রস্তুত হইয়া ছেলেদের পড়াশুনার ব্যবস্থা করিতে গান্ধার রাজ্যের পূর্ব্বপ্রান্তে তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্ধান নিতে আসিয়াছি। বিশ্বাস হইতেছে না? হায়রে বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষিত সংশয়বাদী পাষণ্ড! হা হতভাগ্য দেশ!

কাল সারাদিন তক্ষশিলায় ছিলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের খোঁজ করিতে গিয়া যে কয়টি ঐতিহাসিক সত্য জানিতে পারিয়াছি লিখিয়া দিলাম। রাজা জন্মেজয় তক্ষশিলা জয় করেন। দ্রৌপদীর বিবাহের কিছুদিন পরেই টের পাওয়া গেল যে রাজকুমারী তেমন সুশিক্ষিতা নহেন। শ্রীমতী গান্ধারী তখন দ্রৌপদীকে তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ে গৃহকর্ম্ম (Domestic Economy) ও শিল্পকলা (Fine arts) বিভাগে রাজা অম্ভির (Omphis) দ্বিপঞ্চাশত্তম পূর্ব্বপুরুষ কর্ত্তৃক নবপ্রতিষ্ঠিত Post-nuptial course এ উচ্চতর শিক্ষা ও উপাধি লাভের জন্য পাঠান। উপাধি লাভ করিয়া দ্রৌপদী পুনরায় পঞ্চস্বামীর ঘর করিতে হস্তিনাপুরে ফিরিয়া যান। ইতিমধ্যে শ্রীমান্ অর্জ্জুনও বিদেশে যুদ্ধবিদ্যা ও শিল্পসৌন্দর্য্যজ্ঞান ও "ফ্যাশানে" ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া হস্তিনাপুরে ফিরিয়াছেন। সে সময় অনাবৃষ্টিতে ও ম্যালেরিয়াতে দেশের লোক বড় দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছিল। দ্রৌপদীর তাহাতেও মনে বড় আঘাত লাগিয়াছিল। যে কারণেই হউক, দ্রৌপদী হস্তিনাপুরে ফিরিয়া আসিয়া সাজ সজ্জার প্রতি উদাসীন হইলেন। অর্জ্জুন তাহাতে মনোক্ষুণ্ণ ছিলেন। একদিন বৈকালে দ্রৌপদী তক্ষশীলার আটপৌরে পোষাকে—অর্থাৎ ঢোলা ইজের, লম্বা

কামিজ বা সার্ট, ও মাথায় ওড়না পরিয়া—বাগানে একটি আসনে বসিয়া বৌদ্ধজাতক হইতে একটি অবদান পড়িতেছিলেন। অর্জ্জুন আসিয়া তাঁহার পাঠের বিঘ্ন জন্মাইয়া কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিলেন। দ্রৌপদী তাহাতে একটু বিরক্ত হন। অর্জ্জুন বলিলেন যে রন্ধন ব্যাপারে দ্রৌপদীর সুনিপুণতা দেখিয়া তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের গৃহকর্ম্মবিভাগের উপাধি ও শিক্ষার প্রশংসা করিতেই হয়। কিন্তু পত্নীর সাজসজ্জা দেখিয়া তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিল্পকলা বিভাগের নিন্দা না করিয়া থাকা যায় না। তক্ষশিলার অন্যান্য ছাত্রীগণও কি এইরূপ সাজসজ্জা করেন? পাঁচ স্বামী নিয়া দ্রৌপদী ইতিমধ্যেই ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাহাতে সেদিন নিজের বিশ্ববিদ্যালয়ের নিন্দা শুনিয়া যৎপরোনাস্তি আন্তরিক ক্লেশ অনুভব করিলেন। বাস-ব্যবস্থা-বিধায়ক ( Residential ) বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষিতা দ্রৌপদীর তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি মাতৃভক্তি জাগিয়া উঠিল। তক্ষশিলার সহপাঠিনী সখিগণের প্রতি ঐ শ্লেষোক্তি শুনিবামাত্র Esprit de corps বা সঙ্ঘ সৌহার্দ্দ্যও জাগিয়া উঠিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে আবার ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মাদিষ্ট পতিভক্তি উদিত হইয়া দ্রৌপদীকে বুঝাইয়া দিল যে পঞ্চ পতির অন্যতম হইলেও পতি দেবতা, পতির প্রতি রূঢ়বাক্য প্রয়োগ করা যাইতে পারে না। অর্জ্জুন যবনসংসর্গে আসিয়া শিল্পসৌন্দর্য্যের মায়াতে মুগ্ধ হইয়া বাসনানুগামী ও প্রবৃত্তি-পথবর্ত্তী হইয়াছেন বটে, তাঁহাকে নিবৃত্তিমার্গে ফিরাইয়া আনিতে হইবে। কিন্তু অনিষ্টকারী যবনের প্রতিও হিংসা ত বৌদ্ধধর্ম্ম বিরুদ্ধ। নিমেষের মধ্যে নিজেকে সংযত করিয়া দ্রৌপদী বলিলেন—"প্রাণনাথ, আপনার যাবনিক শিক্ষা দীক্ষা আপনাকে নির্ব্বাণ পথ হইতে ভ্রষ্ট করিয়া বাসনানুগামী করিতে পারে। সত্য বটে, যাবনিক সভ্যতা আপনার মনে শিল্পসৌন্দর্য্যানুভূতি জাগাইয়াছে। তাহাতে প্রবৃত্তি মার্গে চলিবার কালেও ধর্ম্মানুগামী থাকিবার সহায়তা হয়। কিন্তু যদিও অশিক্ষিত ইতর রমণীর মায়া সহজেই কাটাইতে পারেন, "সুভদ্র" রমণীর মায়া কাটান যাবনিক শিক্ষায় তত সহজ হইবে না। আমার সনির্ব্বন্ধ প্রার্থনা, "সুভদ্র" রমণীর মায়ায় আকৃষ্ট হইলে আমাকে তখন সঙ্গে থাকিতে দিতে হইবে। আর যে যবন সভ্যতার সংসর্গে আসিয়া আমাকে আজ আপনি মনোকষ্ট দিলেন তাহাকেও অহিংসা আমার ধর্ম্মাদিষ্ট। সেই জন্য আমার এই সংকল্প—সর্ব্ববুদ্ধের পূজার জন্য, সকল অর্হতের পূজার জন্য, সকল বোধি সত্বের পূজার জন্য, মাতাপিতার পূজার জন্য, আমার পঞ্চপতির কল্যাণের জন্য, আমার মিত্রবর্গের কল্যাণের জন্য ও সর্ব্বসত্বের কল্যাণের জন্য—আমার এই সংকল্প যে যদি কোনও দিন যবন তাহার প্রবৃত্তি মার্গানুবর্ত্তিনী সভ্যতা লইয়া তক্ষশিলায় উপস্থিত হয় তবে তক্ষশিলার ছাত্রছাত্রীগণ যেন যবনের সংস্কারিতা বর্জ্জন করেন।"

ইতিহাসে জানা যায় যে এই ঘটনার পরে খ্রীষ্ট পূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীতে যাবনিক পারস্য সাম্রাজ্য তক্ষশিলা পর্য্যন্ত বা অধিকার করিয়াছিল, খৃষ্ট-পূর্ব্ব ৩২৬ সালে যবন সম্রাট সেকন্দর তক্ষশিলাকে পদানত করিয়াছিলেন, খৃষ্ট-পূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে ব্যাক্ট্রিয়ার যবন গ্রীকগণ ডিমেট্রিয়াসের নেতৃত্বে তক্ষশিলা পার হইয়া পঞ্চনদকুল জয় করিয়াছিলেন, এমন কি ইংরেজ যবন আজও পর্য্যন্ত তক্ষশিলা অধিকার করিয়া বসিয়া আছেন। কিন্তু তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যা-

লয়ের বৌদ্ধ ছাত্রী দ্রৌপদীর সংকল্প—সেই সহকারিতা বর্জ্জন সংকল্প—আজও অটুট রহিয়াছে। ফলে সর্ব্বপ্রথম যবনাধিকার কাল হইতে আজ পর্য্যন্ত তক্ষশিলায় বিশ্ববিদ্যালয় আর পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই সহকারিতা-বর্জ্জন-সংকল্পের এমন হাতে হাতে ফল ইতিহাসে আর একটা পাওয়া সহজ নয়।

যাহা হউক, তোমার বাড়ীর ছেলেরা যেন তক্ষশিলায় পড়িতে না আসে। বন্ধুবাক্য অন্ততঃ একবার হইলেও মানিও। আমি অন্যত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্ধান করিতে যাইব। সন্ধান পাইলে জানাইব। ইতি—

স্বদেশ সেবক নন্দলাল
শ্রীইন্দুভূষণ সেন।

---

# বিশ্ব-ভরা।

নিত্য তোমার মুক্ত খেলা
　　জমত আমার ঘরে,
হাস্যে তোমার ঝরঝরিয়ে
　　পড়ত মাণিক ঝরে।
নৃত্যে তব নাচ্‌ত সাগর
　　লহর তুলে অঙ্গনে,
বুক জড়িয়ে ধরতে মোরে
　　হিয়ার গাঢ় বন্ধনে।
নয়ন মণি! আজকে আমার
　　নওতো একা আর,
নিখিল মাঝে ছড়িয়ে দেছ
　　হর্ষ আপনার।

সবার ঘরে আজকে তুমি
　　বাঁধলে খেলাঘর,
সবার বুকের পরশ লুটে
　　লইছ হিয়া 'পর।
আকাশ বায়ু আলোয় জাগে
　　তোমার হাসি খেলা,
বিশ্ব ভরে নৃত্য সোহাগ
　　তোমার হেলাফেলা।
আপনারে আজ বিলিয়ে দিলে
　　এমনি ভূমণ্ডলে,
ভাবতে যেয়ে স্বার্থ-ব্যথা
　　সকল যে যাই ভুলে।

শ্রীঅবনীমোহন চক্রবর্ত্তী।

# সঙ্গণিকা।

আগামী ১৩২৯ সালের বৈশাখ মাসে নব্যভারত ঊনচল্লিশ বৎসর পূর্ণ করিয়া চল্লিশ বৎসরে পদার্পণ করিবে। ইহার প্রতিষ্ঠাতা ও পরবর্ত্তী সম্পাদকের স্মৃতি রক্ষার জন্য এই কাগজখানি ভাল করিয়া চালাইবার চেষ্টা হইতেছে। ভরসা আছে ইহার হিতৈষীগণ কার্য্যতঃ সহানুভূতি প্রকাশের দ্বারা এই চেষ্টা সফল করিতে সাহায্য করিবেন।

নব্যভারত কখন ও কোন দল বা সম্প্রদায়ের মুখপত্র ছিল না। স্বাধীন ভাবে মতের আলোচনা মঙ্গল জনক মনে করিয়া নব্যভারতের দ্বার সকলের নিকট উন্মুক্ত ছিল। সকল শ্রেণীর চিন্তাশীল লেখকের প্রবন্ধই ইহাতে মুদ্রিত হইয়া আসিতেছিল। এখনও তাহা সেই ভাবে চালাইবার চেষ্টা হইবে। স্বাধীন, নিরপেক্ষ সমালোচনা ভিন্ন সমাজ বা সাহিত্যের উন্নতি হইতে পারে না। এই আদর্শ আমাদেরও লক্ষ্য থাকিবে।

অনেক গ্রাহক এই পত্রের দেয় মূল্য পরিশোধ করেন নাই। আশা করি এই বৎসরের মধ্যেই তাঁহারা তাঁহাদের দেয় মূল্য পরিশোধ করিয়া ইহার উন্নতি সাধনে সাহায্য করিবেন। বিনামূল্যে "নব্যভারত" বিতরণ করিবার সামর্থ্য আমাদের নাই। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য না পাইলে, নব্যভারত প্রেরণ করা সুকঠিন। ভিঃ পিঃ করিলে অনর্থক ব্যয় বাহুল্য হয়। ইহা সকলে ভাবিয়া দেখিবেন।

আশা করি, গ্রাহক পাঠক ও লেখকগণ আমাদের সংকল্প সাধনের সহায় হইবেন।

* * * * * *

শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস, সুভাস চন্দ্র বসু ও বীরেন্দ্র নাথশাসমল এই কয়জনের বিচার স্থগিত রাখিয়া রাখিয়া এত দিনে শেষ হইয়াছে। প্রত্যেকের ছয় মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছে। শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয় তাঁহার কারাদণ্ডের পরে সাধারণের নিকট যে বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে বোঝা যায় যে এই বিচার বে-আইনী হইয়াছে। তিনি বিচক্ষণ আইনজ্ঞ ব্যক্তি সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ নাই। তাঁহার মত আইনজ্ঞ ব্যক্তির মত উপেক্ষনীয় নহে। লর্ড রেডিং এ দেশে রাজ প্রতিনিধি নিযুক্ত হইয়া আসিবার পর নানারূপে আশ্বাস দিয়াছেন যে তিনি আইনের অমর্য্যাদা করিবেন না। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ের নানারূপ অত্যাচার অবিচারের অভিযোগ ও বিশেষরূপে এই ব্যাপারে আইন অনুসারে গুরুতর অবিচার হইয়াছে বলিয়া প্রজা সাধারণের মনে শাসক বর্গের প্রতিশ্রুতি রক্ষা সম্বন্ধে যে সন্দেহের উদয় উঠিয়াছে তাহা অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। লর্ড রেডিং ইতিপূর্ব্বে ইংলণ্ডের প্রধান বিচারপতি ছিলেন। অতি বিচক্ষণ আইনজ্ঞ বলিয়া তাঁহার বিশেষ খ্যাতি আছে। তিনি আইনের মর্য্যাদা রক্ষা করিলে তাঁহার সুনাম ও গৌরব অক্ষুণ্ণ থাকিত।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় দমন নীতি প্রত্যাহার করার প্রস্তাব পাশ হইয়াছে। কিন্তু মন্টেগু শাসন সংস্কার ( Reform Scheme ) অনুসারে প্রস্তাব পাশ হইলেও তাহা কার্য্যে পরিণত করা না করা গবর্ণরের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন। কেননা গবর্ণর ইচ্ছা করিলে তাহা বিফল করিয়া দিতে পারেন অথবা কিছু না করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারেন। এ ক্ষেত্রে তাহাই হইয়াছে। ( যদিও গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী সভাসমিতি বন্ধ করিবার নোটিশের তারিখ শেষ হইয়াছে কিন্তু আর কোন নূতন নোটিশ জারী করা হয় নাই ও কয়েকদিন ধর পাকড় বন্ধ আছে। )

ব্যবস্থাপক সভার কয়েকজন সভ্যের ও দেশের লোকের একান্ত আগ্রহ সত্ত্বে ও মন্ত্রীর বেতন কমান হয় নাই। গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছা না থাকিলে কোন প্রস্তাব পাশ করা কিম্বা গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায়ে কোন প্রস্তাবের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া তাহা রদ করা বিশেষ দুরূহ ব্যাপার। এরূপ স্থলে, গবর্ণমেণ্টের ইচ্ছার বিরুদ্ধে দমন নীতি প্রত্যাহারের প্রস্তাব পাশ হওয়ায়, এই দমন নীতির বিরুদ্ধে দেশের মতের তীব্রতা কত বেশী তাহা বোঝা যায়। গবর্ণমেণ্ট এই প্রস্তাব গ্রহণ করিলে সুবিবেচনার পরিচয় দিবেন।

* * * * * *

মহাত্মা গান্ধি বরদৌলিতে আইন ভঙ্গ করিবার জন্য যে সকল বন্দোবস্ত করিতেছিলেন তাহা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার মনোভাব এই যে, গোরক্ষপুরের অন্তর্গত চৌরি চৌরায় যে ভীষণ দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে তাহাতে বোঝা যায় যে, এখন ও জন সাধারণের মন অহিংস ভাবে বা নির্ব্বিবাদে আইন ভঙ্গ করিবার জন্য প্রস্তুত হয় নাই। এত বড় একটা আন্দোলন আরম্ভ করিয়া নিস্ফল হওয়া অপেক্ষা লোকের মন তৈরীর প্রতীক্ষা করা ভাল এই তাঁহার মত। তিনি যখন মনে করেন নিজের ভ্রম প্রমাদ বা ত্রুটি হইয়াছে তাহা স্পষ্ট বাক্যে প্রকাশ করিতে একটুও পশ্চাৎপদ হন না। ব্যাপক ভাবে আইন-ভঙ্গনীতি ( mass civil disobedience ) প্রবর্ত্তন করিবার পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্টকে নীতি পরিবর্ত্তন করিবার সুযোগ দিবার জন্য ৭ দিনের সময় দিয়া লর্ড রেডিংকে যে খোলা চিঠি লেখেন তাহার পর এইরূপ সিদ্ধান্তে ( বরদৌলি সিদ্ধান্তে ) উপনীত হওয়া সহজ কথা নয়। কিন্তু তাঁহার সত্যনিষ্ঠা অনুপমেয়। সত্যের জন্য আপনাকে লোক চক্ষে ছোট করিতে, আপনার প্রেষ্টিজ বলি দিতে, নিজেকে কুণ্ঠিত মনে করেন না। গবর্ণমেণ্ট যদি প্রেষ্টিজ রক্ষার জন্য অনেক অন্যায়কে ঢাকা দিবার চেষ্টা না করিতেন তবে এ দেশের জন সাধারণের দুঃখের অনেকটা লাঘব হইত।

* * * * * *

ভারতীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের বিগত অধিবেশনে বোম্বাই ও মাদ্রাজের মহিলারা নিজ নিজ প্রদেশ হইতে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় সভ্য নির্ব্বাচনে ভোট দিবার অধিকার পাইয়াছেন। এই সিদ্ধান্ত দ্বারা ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা নারীর ভোট দানের অধিকার এক প্রকার স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু সাধারণ ভাবে এই অধিকার সকল প্রদেশের নারীদিগকে না দেওয়ার একটু কারণ আছে। প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় যে সকল প্রদেশ নারীদিগকে এ অধিকারে বঞ্চিত করিয়াছেন সেই সকল দেশের নারীদিগকে এই

উচ্চতর অধিকার দেওয়া যেন অসঙ্গতিদোষ দুষ্ট বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তাই এই অধিকারটী তাঁহারা (ইচ্ছা থাকিলে ও) ব্যাপক ভাবে প্রদান করিতে পারেন নাই। বাঙ্গালার দুর্ভাগ্য বশতঃ এখানে এ প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়া ও পাশ হয় নাই। সুতরাং ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সিদ্ধান্তটী বাঙ্গালায় প্রয়োগ করা সম্ভবপর হয় নাই। বাংলা দেশেই স্ত্রী শিক্ষা ( University education ) প্রথম প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে ও বাঙ্গালার মহিলারা বহুপূর্ব্বেই নিজের আসন করিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় বাঙ্গলা প্রায় সমস্ত বিষয়েই পূর্ব্বের মতন আর অগ্রসর নাই। এ বিষয়েও বোম্বাই মান্দ্রাজ প্রভৃতির নিকট পরাস্ত হইয়াছে। তথাপি বাংলার যোগ্যতা অস্বীকার করা যায় না। বাংলার নারীদিগকে অধিকার দিলে সুফল ফলিত না একথা কেহ বোধ হয় বলিবেন না।

* * • • • •

নব্যভারতের অকৃত্রিম হিতৈষী, সুহৃদ ও লেখক ডাঃ প্যারী শঙ্কর দাস গুপ্ত ও বঙ্গবাসীর প্রাণ-স্বরূপ বিহারীলাল সরকার মহাশয়দ্বয়ের পরলোক গমনের সংবাদ পাইয়া আমরা অতীব দুঃখিত হইয়াছি। প্যারীশঙ্করবাবু বহুদিন যাবৎ নব্যভারতের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগে যুক্ত ছিলেন। মাঘ মাসের নব্যভারতেও তাঁহার লেখা প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি মেডিক্যাল কলেজ হইতে বহু পূর্ব্বে এল এম এস্ পাশ করেন। তিনি পরে এলোপ্যাথী চিকিৎসা পরিত্যাগ করিয়া হোমিওপ্যাথী চিকিৎসাতে বিশেষ যশস্বী হইয়াছিলেন। তিনি বগুড়ার সর্ব্বজন প্রিয় লোক ছিলেন; তিনি তথাকার কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে নব্যভারত একজন অকৃত্রিম বন্ধু হারাইয়া বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। ৺বিহারীলাল সরকার মহাশয় বঙ্গবাসীতে মাত্র ৩০ টাকা বেতনে কেরাণীর কাজে প্রবেশ করিয়া শেষে ইহার কর্ণধার স্বরূপ হইয়াছিলেন। ইহার অনেক পুস্তক আছে। ইনি অনেক সুন্দর সুন্দর সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন ও বিদ্যাসাগরের এক বৃহৎ জীবনী রচনা করেন। আমরা শোকসন্তপ্ত পরিবারের সহিত সমবেদনা ও সহানুভূতি জানাইতেছি।

* * * * • *

# আহার ও চরিত্র।

সভ্য দেশে আহারের সহিত চরিত্রের কোন সংস্রব থাকা স্বীকৃত হয় না। সে সকল দেশে সুপাচ্য, পুষ্টিকর এবং স্বাদু যে পদার্থই হউক না কেন তাহাই লোকে ভক্ষণ করিয়া থাকে। তাহাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রেও বলে যাহা মুখ হইতে বাহির হয় তাহা অপবিত্র কিন্তু যাহা মুখের মধ্যে প্রবেশ করে তাহা অপবিত্র নহে।" সুতরাং লোকে যাহা ইচ্ছা তাহাই ভোজন করিয়া থাকে। আহারের সহিত চরিত্রের সংস্রব থাকা তাহারা বুঝে না এবং স্বীকারও করে না। চির দিন এই ভাবে চলিয়া আসিতেছে। এখন কিন্তু সে সকল দেশেও পণ্ডিতগণের মতের পরিবর্ত্তন হইতেছে। বিখ্যাত পণ্ডিত রেল্যাঙ্কেষ্টার কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন যে, বহুলোক একত্রিত হইয়া এক টেবিলে বসিয়া অনেকক্ষণ গল্প সল্প করিতে করিতে ভোজন করিবার যে প্রথা আছে তাহা বর্জ্জনীয়। কিন্তু তিনি আহার্য্য পদার্থের সহিত চরিত্রের সংস্রব থাকা না থাকার বিষয় কিছুই বলেন নাই। পণ্ডিত প্রবর পানেট সম্প্রতি এতদুভয়ের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকা অনুমান করিয়াছেন। কিন্তু প্রায় সকল দেশেই পণ্ডিতগণের উপদেশ গ্রহণ করিবার পথে অনেক বাধা উপস্থিত হয়।

প্রাচীন কাল হইতেই এতদ্দেশীয় সংস্কার অন্যরূপ। এতদ্দেশে আহারের সহিত চরিত্র গঠনের বিশেষ সম্বন্ধ থাকা বহুকাল হইতে স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। আহার্য্য পদার্থকে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক, এই তিন শ্রেণীতে বিভাগ করা এতদ্দেশীয় নিয়ম। শ্রুতি ও পুরাণ শাস্ত্রে ভক্ষ্যাভক্ষ্য পদার্থের বর্ণনা বহুস্থানেই দৃষ্ট হয়। মাস ভেদে, তিথি ভেদে ও ভক্ষ্যাভক্ষ্য নির্ণীত হইয়া থাকে। কোন পদার্থ নিত্যই অভক্ষ্য এবং কোন পদার্থ নিত্য ভক্ষ্য, এরূপ বিধি নিষেধও দেখা যায়। এ সকল বিধি নিষেধ কেবল যে শারীরিক কারণের উপরই প্রতিষ্ঠিত তাহা বোধ হয় না; মানসিক ইষ্টানিষ্টের সহিত ও ইহার সম্বন্ধ থাকা বিবেচনা হয়।

আহারের সহিত চরিত্রের সম্বন্ধ থাকা নানারূপে প্রতীয়মান হয়। তন্মধ্যে আমরা কেবল বর্ণের কথাই আলোচনা করিব। আহার (দৈহিক) বর্ণের নিয়ামক, বর্ণ চরিত্রের পরিচায়ক। এইরূপে আহারের সহিত চরিত্রের সম্বন্ধ থাকা প্রতিপন্ন হয়।

ব্যক্তির বর্ণ কতিপয় পদার্থের উপর নির্ভর করে। সে সকলকে বর্ণোপকরণ বলিব। পুংকোষ এবং স্ত্রীকোষের মধ্যে বর্ণের বীজ * নিহিত থাকে, সেই বীজই বর্ণোপকরণের সুতরাং বর্ণের নিয়ামক। বর্ণোপকরণ মধ্যে অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, অঙ্গার, ফস্‌ফরাস, গন্ধক ইত্যাদি পদার্থ থাকে। এ সকল পদার্থ আহার্য্য বস্তু হইতে দেহ মধ্যে উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ আহার্য্য বস্তু বিশ্লিষ্ট, হইয়া এই সকল পদার্থ জাত হয়। ইহারা মিশ্রিত হইয়া বর্ণোপকরণ § গঠিত করে। বর্ণোপকরণ দেহের বাহ্যত্বকের নীচে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং ক্রমে ক্রমে ত্বকের

---

* মেণ্ডেলিয়ান ভাষায় ইহাকে Factor বলে।

§ Pigment শব্দ এখানে বর্ণোপকরণ শব্দটি উভয়কেই বুঝিতে হইবে।

রন্ধ্র দ্বারা নির্গত হইয়া যায়। আহার্য্য পদার্থের কিয়দংশ দেহ পোষণে ব্যবহৃত হয় এবং কিয়দংশ স্বভাবতঃই পরিত্যক্ত হইয়া যায়। বর্ণোপকরণ এই শেষোক্ত শ্রেণীর পদার্থ। নিত্য আহার দ্বারা নিত্যই বর্ণোপকরণ প্রস্তুত হইতেছে এবং নিত্যই কিছু কিছু পরিত্যক্ত হইতেছে। বাহ্যত্বকের নিম্নস্থ সঞ্চিত বর্ণোপকরণের দ্বারাই ব্যক্তির বর্ণ নির্ণীত হইয়া থাকে।

ব্যক্তির বর্ণ প্রতিদিন সকল সময় এক প্রকার থাকে না, সকল বয়সেও একরূপ থাকে না স্বাস্থ্যে এবং পীড়ায় বর্ণের প্রভেদ ঘটিয়া থাকে। আর্সেনিক প্রভৃতি কতিপয় পদার্থ সেবন করিলেও বর্ণের তারতম্য ঘটিয়া থাকে। হর্ষ বিষাদ ক্রোধ ইত্যাদি হইলেও বর্ণের পার্থক্য হয়। এ সকল সর্ব্বজনবিদিত কথা। ঈদৃশ স্থলে বর্ণোপকরণের গঠনের ইতর বিশেষ হইয়া থাকে, অথবা রক্তাধিক্য কিম্বা রক্ত হীনতা হয়।

এইরূপ অবস্থা অস্থায়ী কিন্তু স্থায়ী বর্ণ বর্ণোপকরণের স্থায়ী গঠনের উপর নির্ভর করে। তাহা উপরের লিখিত "বীজ" পদার্থের ফল।

পিতামাতা সাদা ও কাল বর্ণের হইলে তাহাদিগের সন্তান কাল অথবা প্রায় কাল হয়। ঐ সন্তানদিগের সন্তান সন্ততি সাদা এবং কাল উভয় প্রকারই হইয়া থাকে। যে বিধান অনুসারে এইরূপ হয় তাহা বিখ্যাত মেণ্ডালের বিধানের একাংশ। সাদা কালোর সন্তান কাল হওয়ায় সাদা অপেক্ষা কালকে প্রবল বর্ণ বলা হইয়া থাকে। কাল প্রবল বর্ণ, সাদা দুর্ব্বল বর্ণ। কাল হইতে কোন পদার্থ বাদ পড়িলে সাদা বর্ণ উৎপন্ন হয়। প্রত্যেক কাল বর্ণেই সাদা বর্ণ আছে এবং আরও কিছু আছে। এই প্রভেদ বশতঃই সম্ভবতঃ মনোবৃত্তির সুতরাং চরিত্রেরও পার্থক্য হয়। কিন্তু এক কারণে কিছুই হয় না, নানা কারণ বশতঃই একটা ফল উৎপন্ন হয়। চরিত্রের যত প্রকার কারণ আছে তন্মধ্যে বর্ণবীজ সুতরাং বর্ণোপকরণ একটী উল্লেখ যোগ্য কারণ। চরিত্র কিম্বা স্বভাবের বাহিক কারণও আছে, আভ্যন্তরিক কারণও আছে। উভয় শ্রেণীরই নানাবিধ কারণ আছে। আভ্যন্তরিক কারণ সকল মধ্যে আমরা বর্ণবীজের কথাই এস্থলে উল্লেখ করিতেছি।

দেখিলাম, আহার হইতে বর্ণবীজ, বর্ণবীজ হইতে বর্ণোপকরণ, তাহা হইতে ব্যক্তির বর্ণ উৎপন্ন হয়।* এক্ষণে বর্ণের সহিত চরিত্রের সম্বন্ধ দেখাইবার সময় উপস্থিত হইয়াছে।

পণ্ডিত প্রবর পানেট্ মহোদয়ের মেণ্ডেলিজম গ্রন্থের (১৯১৯ খৃঃ) ২০৭ পৃষ্ঠায় দেখা যায় যে লণ্ডনস্থ জাতীয় চিত্রশালায় যে সকল বিখ্যাত নরনারীর চিত্র রক্ষিত রহিয়াছে তাহার মধ্যে সৈনিক ও নাবিকগণের চক্ষু প্রায়শঃ ব্লু-বর্ণের, এবং ধর্ম্ম প্রচারক, বাগ্মী ও নটদিগের অধিকাংশের চক্ষু কাল বর্ণের। পণ্ডিত প্রবর বলিতেছেন "The facts are suggsetive" প্রকৃত পক্ষেও কাল বর্ণের সহিত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিবিধ সদ্গুণের যোগ থাকা দেখা যায় এবং সাদা বর্ণের সহিত প্রায়শঃ নিষ্ঠুরতা হঠকারিতা লোভাদির যোগ থাকা প্রতীয়মান হয়। পানেট্ মহোদয় সন্দেহ

---

* স্থায়ীবর্ণ শীতাতপ বশতঃ হয় না। গ্রীনল্যাণ্ড ল্যাপল্যাণ্ড দেশের এস্কুইমো অথবা এস্কুইমস্ জাতি সাদা নহে, সাহারা মরুভূমির নিকটস্থ টুরেগ জাতিও কাল নহে। বংশানুক্রমে টুরেগরা সাদা বর্ণের এবং এস্কুইমো-গণ আজকাল (brown) বর্ণের। গরম দেশেও সাদাবর্ণ, শীতের দেশেও প্রায় কালবর্ণ বংশানুক্রমে সর্ব্বত্রই জাত হইতেছে।

করিয়াছেন যে বর্ণোপকরণের* সহিত মনোভাবের† মনে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকিতেও পারে। আমার হয়, যাঁহারা দীর্ঘকাল সাদাবর্ণের‡ ব্যক্তিগণের ব্যবহার লক্ষ্য করিয়াছেন তাঁহারা বুঝিয়া থাকিবেন যে ঐ সকল ব্যক্তিগণের মনে সত্ত্বগুণের অনেক অভাব থাকে, অন্ততঃ কালোর সহিত তুলনায় অপেক্ষাকৃত সত্ত্বগুণের অভাব অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকিবেন। আমি একবার দেখিয়াছি একজন সাদাবর্ণের ব্যক্তি একজন কালবর্ণের বালককে বেত মারিতে মারিতে বালকটি অজ্ঞান হইয়া গেল, তাহার উপরও প্রহার চলিতে লাগিল। আমার স্মরণ হয় ঐ ক্ষেত্রে ক্রোধেরও বিশেষ কারণ ছিল না। সাদা ব্যক্তির সম্মুখে কালো ব্যক্তি ছাতা মাথায় দিলে, ঘোড়ার পৃষ্ঠ হইতে না নামিলে, সেলাম না করিলে—এই রকম তুচ্ছ কারণে অনেক সময় সাদা যেরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার করিতে পারেন, কাল ব্যক্তি প্রায়শঃ তাহা পারে না। ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় অথবা বিজ্ঞান বিষয়ক মতভেদ হেতু সাদা ব্যক্তিগণ জীবিত মনুষ্যকে খুঁটায় বাঁধিয়া আগুনে পোড়াইয়াছে, আজীবন অন্ধকূপে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে এবং নানারূপে দারুণ অত্যাচার করিয়াছে। কালবর্ণ জাতি ঈদৃশ মতভেদ হেতু এরূপ ভীষণ ব্যবহার করিতে সমর্থ হইবে না। দাসপ্রথা যখন স্পষ্টভাবে নগ্নমূর্ত্তিতে প্রচলিত ছিল তখন ইক্ষু আবাদ করিবার জমি সংগ্রহের নিমিত্ত নানা-দেশীয় নানাজাতীয় সাদা ব্যক্তিগণ নরশিকার করিয়াছে। মহাত্মা ডারুইন এ বৃত্তান্ত সংযতভাবে লিখিবার চেষ্টা করিয়াছেন বটে কিন্তু সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হন নাই। জগতের ইতিহাসে কালোর বিরুদ্ধে এরূপ অভিযোগ প্রায় শুনা যায় না, বলিলেই হয়। সকলজাতি মধ্যেই সাদা ব্যক্তি প্রায়শঃ কঠোর হয়, বীর হয়, নির্ভীক হয় অধ্যবসায়ী হয়, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয় কিন্তু কাল ব্যক্তিগণ অধিকতর ন্যায়পরায়ণ হয়, অধিকতর ধর্ম্মপরায়ণ হয়। বিনয়, নম্রতা, দয়া, পরোপকার প্রভৃতি কোমল গুণ সকল অধিকমাত্রায় কালবর্ণের সহিত প্রায়শঃ যুক্ত থাকে। কয়েকমাস পূর্ব্বে একটি ধর্ম্মপরায়ণ সাদা ব্যক্তি অনাহারে প্রাণত্যাগ করিল, তথাপি সাদা কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহার প্রতিজ্ঞা হইতে তিলমাত্র বিচলিত হইলেন না। এ বৃত্তান্ত কালোরা স্তম্ভিত হইয়া শুনিয়াছে। কিন্তু সাদারা ইহাতে বিশেষ কিছু দোষ দেখিতে পায় নাই। প্রাচীন আর্য্যগণ হইতে বর্ত্তমান যুগের সাদা ব্যক্তিগণ কালোর উপর যুগ যুগান্তর হইতে পীড়ন করিয়া আসিতেছে। কালো অন্যায়পূর্ব্বক কাহারও দেশ অধিকার করে না, সুতরাং ঐ কার্য্যের নিত্যসহচর যে অত্যাচার তাহাও তাহাদিগের করিতে হয় না। করিলেও বিশেষ উত্তেজক কারণ না থাকিলে কেবল প্রতিপত্তি অথবা অর্থ লোভের বশবর্ত্তী হইয়া অধিকাংশ স্থলেই ঐ প্রকার ব্যবহার করে না। যাহারা লাল অথবা পীতবর্ণের পিপীলিকার সহিত কাল পিপীলিকার তুলনা করিয়া দেখিয়াছেন তাঁহারাও বোধ হয় উভয়ের ব্যবহারে উল্লেখিত প্রকার পার্থক্যই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। ডাক্তার ওয়ার (Weir) তদীয় গ্রন্থে§ এতদুভয় বর্ণের দুই দল পিপীলিকার যুদ্ধ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত শিক্ষাপ্রদ। বর্ত্তমান যুগে সাদা ব্যক্তিগণ পরস্পর কেহ কাহাকে বিশ্বাস করে না। পরস্পর সকলেই জানে,

* Pigmantation

† Peculiarities of mind—এই ভাষা তিনি ব্যবহার করিয়াছেন।

‡ যে জাতিরই হউক।

§ Dawn of reason

তাহারা আবশ্যক হইলে কতদূর পর্য্যন্ত গর্হিত আচরণ করিতে পারিবে। সুতরাং কেহ কাহাকে আস্থা করিতে পারে না। কাল ব্যক্তিগণও এই বিষয়ে প্রায় তদ্রূপ, কিন্তু ঠিক তদ্রূপ নহে। তথাপি ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে সাদাবর্ণও কতিপয় উচ্চশ্রেণীর সদ্‌গুণের সহিত যুক্ত থাকিতে দেখা যায়, এবং কাল বর্ণও কতিপয় নিকৃষ্ট অসদ্‌গুণের সহিত কখন কখন সংযুক্ত থাকে। চর্ম্মের বর্ণ, চক্ষুর বর্ণ, দন্তের বর্ণ, হস্তপদের তলভাগের বর্ণ, ওষ্ঠের বর্ণ ইত্যাদি নানাস্থানের বর্ণের সহিত মানব চরিত্রের কিরূপ সংশ্রব তাহা অদ্যাপি যথাযোগ্যভাবে আলোচিত হয় নাই। হওয়া অত্যাবশ্যক। কেবলমাত্র বিজ্ঞান আলোচনার নিমিত্ত আবশ্যক তাহা নহে, সমাজ তত্ত্বের একটী গুরুতর অংশ এ আলোচনার উপর সম্ভবতঃ নির্ভর করিবে। কোন একটী জাতি সম্বন্ধে এক্ষণে বিশেষ কিছু বলা যাইতেছে না। সকল জাতিতেই সাদা কালো আছে। মানব এবং মানবেতর প্রাণী—উভয়ই আলোচিত হওয়া উচিত। আমি নানাস্থানে যাহা দেখিয়াছি এবং পাঠ করিয়াছি তাহাই উপরে বিবৃত করিলাম। প্রত্যেকেই আপন আপন অভিজ্ঞতার সহিত মিল করিয়া লইতে পারেন। আমার ধারণা হইয়াছে যে কালো অপেক্ষা সাদা সর্ব্ব গুণে হীন। এমন যে আত্মরক্ষা বৃত্তি, যাহা সার্ব্বজনীন, তাহাও যেন সাদার তুলনায় কালোর কিছু কম। একথা সত্য হইলে পরিণাম ভয়াবহ হইয়া উঠে।

শ্রীশশধর রায়।

---

## হাফিজ।

তন্বী নারী ছিল যে এক—
দর্পণেতে তার
ফেল্‌লে এসে সর্ব্বনাশা
উজল রূপের ভার,
কুমালখানি রাখ্‌তে পারে
ব'ল্‌লে মোরে হেসে—
স্মৃতির পারে ছিলে বঁধু
কোন্ ধেয়ানের দেশে।

*   *   *

চোখের জলে ভিজিয়ে দিনু
প্রিয়ায় অলক্ রাশ
ঘুচিয়ে সেকি দেবে আমার
ভবিষ্যতের ত্রাস?
ছাড়িয়ে অলক, ব'ল্‌লে প্রিয়া—
লওগো মোরে বুকে
কাল হারাবার ভয়টা ছেড়ে
আজ ক্ষণিকের সুখে।

*   *

মূর্খ যারা—নিজের কথা
ভেবেই মরে শোকে,
বিরাট মহান সৃষ্টি এটা
প'ড়ছে নাকো চোখে;
চোখের তারা দিচ্ছে নাকি
চোখটা খুলে তোর?
অন্ধ তা'রা নিজের পানে
পরের রূপেই ভোর।

*   *   *

তোমায় দেওয়া একটী দুখে
ভুলিয়ে দেছ কত
দীর্ণ হিয়ার জ্বালা শতেক
যন্ত্রণারি ক্ষত;
হৃদয়টী মোর দেখ্‌ছ প্রিয়া
দুখের আগুন জেলে—
ভিতরটী মোর হচ্ছে বাহির
সোণার বরণ মেলে।

শ্রীকান্তিচন্দ্র ঘোষ।

# চট্টগ্রাম ও বাঙ্গলানগরী।

বাঙ্গলানগরী বঙ্গ ইতিহাসে একটী বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া থাকিলেও ইহার বিষয় অনেকেই পরিজ্ঞাত নহেন। তজ্জন্যই ইহার সম্বন্ধে আলোচনা করা আবশ্যক বোধ করি।

পর্টুগীজদিগের লিখিত বিবরণেই প্রথম "বাঙ্গলা" নগরীর উল্লেখ দেখা যায়। পর্টুগীজেরা বঙ্গদেশে প্রথম চট্টগ্রামেই বাণিজ্যার্থ অবতীর্ণ হন। তাঁহারা ইহার বাণিজ্য উপযোগিতা বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া ইহাকে Porto Grande অর্থাৎ "বৃহৎ বন্দর" আখ্যা প্রদান করেন। পর্টুগীজেরা চট্টগ্রামে অবতরণ করিবার পূর্ব্বেই চট্টগ্রাম বঙ্গদেশের প্রধান বন্দর ছিল। এবং ইহা বঙ্গদেশের প্রধান দ্বার স্বরূপও ছিল। বঙ্গে পর্টুগীজ ইতিহাসের গ্রন্থকার এ সম্বন্ধে লিখিতেছেন :—

When the Portuguese came to Bengal, Chittagong was its chief port, the main gateway to the royal capital Gowe. Its geographical position lent it importance", History of the Portuguese in Bengal by J. J. A. Campas p. 21

পর্টুগীজদিগের বিবরণে যেমন আমরা Porto Grande বলিয়া প্রধান বন্দরের উল্লেখ প্রাপ্ত হই তেমনই Cidade de Bengala 'City of Bengala', বাঙ্গলা নগরী বলিয়া একটী প্রধান নগরীরও উল্লেখ প্রাপ্ত হই। এই নগরী সম্বন্ধে স্পষ্ট উল্লেখ থাকিলেও ইহার প্রকৃত সংস্থান বিশেষ বিতর্কিত বিষয় হইয়া রহিয়াছে। এই বিতর্কের কিরূপ মীমাংসা হইতে পারে এক্ষণে তাহাই আমাদের বিশেষ বিচার্য্য হইতেছে।

"বঙ্গের পর্টুগীজ ইতিহাস" গ্রন্থে "বাঙ্গলা নগরীর" প্রথম বিবরণ এইরূপে প্রদত্ত হইয়াছে :—

"Duarte de Barbosa, who was one of the earliest Portuguese to write a geographical account of the African and Indian coasts says, * "......this sea (Bay of Bengal) is a gulf which enters towards the north and at its inner extremity there is a very great city inhabited by moors which is called Bengala with a very good harbour Ibid p. p 75-76

পর্টুগীজদিগের বঙ্গের বাণিজ্যে চট্টগ্রামের সহিতই যে প্রথম সংস্রব সংঘটিত হয় তাহার স্পষ্ট ইতিহাসই পাওয়া যায়—

The earliest commercial relations of the Portuguese in Bengal were with Chittagong (Porto Grande), De Barros writes in 1532 "Chittagong is the most famous and wealthy city of the Kingdom of Bengal on account of its port, at which meets the traffic of that eastern region" Ibid p. 113.

---

* The coasts of East Africa and Malabour Hakl Ed p. 178—9.

পরবর্ত্তীকালে চট্টগ্রামের বাণিজ্য কেন্দ্ররূপে প্রাধান্য হ্রাস প্রাপ্ত হইলেও ইহা পর্টুগীজদিগের অন্তর্ব্বাণিজ্য ও বহির্ব্বাণিজ্য উভয় বাণিজ্যেরই দ্বারস্বরূপই বর্ত্তমান ছিল। বঙ্গে পর্টুগীজদিগের ইতিহাস লেখক বলিতেছেন :—

Portuguese ships used to go to Chittagong with their goods, though Hoogly was a more frequented port. In 1567 Caesarde Federica found more than eighteen ships anchored in Chittagong and he writes that from this port the trader carried to the Indies "great store of rice, very great quantities of bombast cloth of every sort, sugar, corn, and money with other merchandise' * Ibid p. 113

এস্থলে চট্টগ্রাম যেরূপ বন্দর ও পোতাশ্রয় বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, তৎসহ পর্টুগীজ ভৌগোলিক বারবোসার বাঙ্গালা নগরীর সম্বন্ধে উদ্ধৃত বর্ণনার তুলনা করিলে উভয়ের মধ্যে এরূপই সম্পূর্ণ সাদৃশ্য লক্ষিত হয় যে উভয়কে অভিন্ন বলিয়া বিবেচনা করিতে আমাদের কোন দ্বিধা বোধ হয় না।

বঙ্গের পর্টুগীজ ইতিহাস লেখক কেম্পস, চট্টগ্রাম বঙ্গে যখন পর্টুগীজদিগের প্রধান বন্দর ছিল—তখন বঙ্গের প্রধান বাণিজ্য স্থান "বাঙ্গলা নগর" চট্টগ্রামই হইবে—এই যুক্তিতেই চট্টগ্রামের সহিত বাঙ্গলা নগরের অভিন্নতা প্রতিপাদিত করিয়াছেন—

"As Chittagong was the great port of Bengal it was more likely the Great city of Bengala' Ibid. p. 77

এক্ষণে বাঙ্গলা নগরের সংস্থান সম্বন্ধে যে সমস্ত প্রমাণ পাওয়া যায় তৎসমস্ত দ্বারা কি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় তাহাই আমরা বিচার করিয়া দেখিব। পাশ্চাত্য ভৌগলিকেরা বিভিন্ন মানচিত্র অঙ্কন দ্বারা বাঙ্গালা নগরের স্থান স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তৎসমস্ত কোন কোন ভৌগোলিক চট্টগ্রামেরই সহিত বাঙ্গালা নগরের একই অবস্থান প্রদর্শন করিয়াছেন, কেহবা চট্টগ্রামেরই বিপরীতদিকে কর্ণফুলী নদীর দক্ষিণ তীরে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। আমরা "বঙ্গে পর্টুগীজদিগের ইতিহাস "হইতে বাঙ্গলা নগরের সংস্থান সম্বন্ধে বিভিন্ন মন্তব্য সকল নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—

Lord Stanley of Alderly understands this city of Bengala to have been Chittagong and in a note says that where *Ortelins* places Bengala Hornmans places Chatigam or Chittagong. Considering a chart of 1743 in Dalrymple, Chittagong as Yule remarks † seems to have been the city of Bengala. Obington in giving the boundaries of the Kingdom of Arakan remarks "Teixcira and generally the Portuguese writers reckon that ( Chittagong ) as a city of Bengala ; and not only so, but place the City of Bengâla itself upon the same coast more south than Chatigam.

* Hobson—Jobson S. V. Bengal.

† Purchas, His pilgrims, C. Frederick Vol. 5. p. 138.

"In Bleiv's map which is not generally accurate, the City of Bengala is placed in the southern bank of the Karnaphuli more or less where Van den Broncke places Dainga. Vignola in a map of 1683 assigns the same position to the city of Bengala. But in a old Partuguse map in Thevenot the city of Bengala is placed above Katigam ( Chittagong ) or it is meant to be Chittagong itself. Ibid. p. p. 76—77

এই সমস্ত মন্তব্যের আলোচনা করিলে চট্টগ্রামকেই বাঙ্গলা নগর বলিয়া বুঝিতে আমাদের কোন কষ্ট হয় না। কারণ বাঙ্গলা নগরকে চট্টগ্রাম বলিয়া স্বীকার করা হউক বা না হউক বাঙ্গলা নগর যে চট্টগ্রামের বিশেষ সন্নিকট ছিল তৎসম্বন্ধে কোন মত দ্বৈধই থাকিবার কথা নয়। যখন বাঙ্গলা নগর চট্টগ্রামের সন্নিহিত বলিয়াই স্বীকৃত হইতেছে; অথচ চট্টগ্রামের সন্নিহিত বাঙ্গলা নগর বলিয়া কোন স্থানের সন্ধান পাওয়া যাইতেছেনা বা কোন স্থান সম্বন্ধে বাঙ্গলা নগরীর ন্যায় বাণিজ্য খ্যাতির কথাও জানা যাইতেছে না, তখন স্বভাবতঃ চট্টগ্রামকেই যে বাঙ্গলা নগরী বলিয়া মনে করিতে ইচ্ছা হয় তাহা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন। ইতিহাস লেখক কেম্পস্ ও এই সিদ্ধান্তেরই পক্ষপাতী হইয়াছেন। তিনি লিখিতেছেন:—

"Without at all enquiring into the relative accuracy of these maps, it may be safely asserted that all evidence points to the conclusion that Chittagong was the real city of Bengal, spoken of, by the early writers" Ibid p. 77.

এক্ষণে বাঙ্গলা নগরের নামকরণ কিরূপে হয় তাহাই প্রশ্ন হইতেছে। ঐতিহাসিক কেম্পস্ সাহেবের মতানুসারে এই নামকরণটী পর্টুগীজদিগের দ্বারাই হয় এবং তাঁহারা ইহাতে আরবদিগের মধ্যে প্রচলিত রীতিরই অনুকরণ করে। দেশের নামানুসারে বৈদেশিক নগরের বা বন্দরের নাম প্রদান করা ইহাই আরবদিগের প্রথা ছিল। কেম্পস্ লিখিয়াছেন:—

"The Arabs and later on the Portuguese generally named a foreign important city or a seaport after the country in which it was situated" Ibid. p. 77..

ঐতিহাসিক কেম্পস্ আরও সারগর্ভ যুক্তি প্রয়োগ দ্বারা চট্টগ্রামের সহিত বাঙ্গলা নগরীর অভিন্নতা প্রদর্শন করিয়াছেন। আমরা তদীয় সুযুক্তিপূর্ণ মন্তব্য এস্থলে উদ্ধৃত করা একান্ত কর্ত্তব্য বোধ করিতেছি:—

All the Portuguese commanders that came to Bengal first entered Chittagong. In fact to go to Bengal meant to go to Chittagong. It is the "City of Bengala" referred to in the early portuguese writings Ibid p. 21.

"যে সকল পর্টুগীজ সেনাপতি বাঙ্গালাদেশে আগমন করিতেন তাঁহারা প্রথমে চট্টগ্রামে প্রবেশ করিতেন। প্রকৃত পক্ষে বাঙ্গালায় যাওয়া বলিতে চট্টগ্রামে যাওয়াই বুঝাইত। ইহাই প্রাচীন পর্টুগীজ লেখকদিগের বাঙ্গালা নগরী বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়াছে॥"

ইহা হইতে বাঙ্গালার মধ্যে বাণিজ্য সম্পর্কে শ্রেষ্ঠ স্থান বলিয়া বাঙ্গালার আদর্শ বলিয়া মনে করাতেই যে পর্টুগীজগণ চট্টগ্রামকে বাঙ্গলা নগর আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন তাহাই আমরা স্পষ্ট উপলব্ধি করিতে পারিতেছি।

পর্টুগীজদিগের লিখিত "Cidade de Bengala" নাম হইতে ও এই নামটী তাঁহাদের প্রদত্ত বলিয়াই বুঝিতে পারা যায়। "বাঙ্গলা নগর" নামটী যে পর্টুগীজদিগের প্রদত্ত কেবল তাহাই নহে পরন্তু ইহা শুধু তাহাদিগের দ্বারা ব্যবহৃত হইত বলিয়াও অনুমিত হয়। তাহাতেই পর্টুগীজদিগের কাগজপত্রে ও ইতিহাসে ইহার উল্লেখ থাকিলেও, চট্টগ্রামের ইতিবৃত্ত বা কিম্বদন্তিতে এই নামটীর কোন উল্লেখই পাওয়া যায় না। এই প্রকারে নামটীর সহিত স্থানিক সংস্রব না থাকায় ইহা এমন কি পাশ্চাত্য ভৌগলিক দিগের দ্বারাই কাল্পনিক নগরী মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে :—

Though I confess a late French geographer has put Bengala in his catalogue of imaginary cities Ovington (1600) A voyage to Surat p. 554

সুতরাং চট্টগ্রামের Porto grande নাম যেমন পর্টুগীজদিগের প্রদত্ত বাণিজ্য সম্বন্ধীয় নাম, বাঙ্গলা নগরী নামটীও ইহার তেমনই বাণিজ্য সম্বন্ধীয় নাম। তাহাতেই ইহাদের কোন নামেরই কোন স্থানীয় নিদর্শন বর্ত্তমান নাই। কিন্তু তাহা হইলেও সমগ্র বাঙ্গলা দেশের নামে যে চট্টগ্রাম ইউরোপীয় প্রথম বণিকদিগের নিকট হইতে বাঙ্গলা নগরী নাম প্রাপ্ত হইয়াছিল, এই নামে ইউরোপীয় বাণিজ্যের প্রথম সূচনায় চট্টগ্রামের অসাধারণ প্রতিপত্তির অক্ষয় স্মৃতি চিহ্ন চিরকাল দেদীপ্যমান থাকিবে। পাশ্চাত্য কবিও যে চট্টগ্রামের এই প্রতিপত্তি কীর্ত্তন করিয়া ইহাকে সাহিত্য জগতে অমরতা প্রদান করিয়া গিয়াছেন তাহা চট্টগ্রামের পক্ষে কম শ্লাঘার কথা নয়। আমরা সেই কবিতাটী উদ্ধৃত করিয়া আমাদের প্রবন্ধটীকে শেষ সৌষ্ঠব প্রদান করিতেছি।

"See Chattigam, amid the highest high
In Bengal province, proud of varied store
Abundant, but behold how placed the Post
Where sweeps the shore line towards the southing coast.

Lusiadas, Canto xs. cxxi by Camões Berton's Trans. quoted in the History of the Portuguese in Bengal by J. J. A. Campos p. 66.

---

# কৃষিকৈবর্ত্ত-মাহিষ্য।

বঙ্গের কৃষিকৈবর্ত্তজাতির প্রকৃত তত্ত্ব এখনও সাধারণের অবগতিতে আইসে নাই। তজ্জন্য এই জাতির প্রতি হিন্দু সমাজের ব্যবহার সকল স্থানে সমান নহে। ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলার ব্রাহ্মণ কায়স্থগণ এই জাতির প্রতি অযথা অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন। এই অবজ্ঞার কারণ অলীক জনশ্রুতি-জাত কুসংস্কার। অধিকন্তু কতকগুলি আধুনিক গ্রন্থকারের ভ্রম-প্রমাদ ও নিন্দাতেও কাহার কাহার এই কুসংস্কার ও সামাজিক ব্যাধি বদ্ধমূল হইতেছে। এই শ্রেণীর গ্রন্থের মধ্যে বিশ্বকোষ অভিধান সর্ব্বাগ্রে উল্লেখ যোগ্য। বিশ্বকোষকে অনেকেই ঐতিহাসিক অভিধান মনে করেন। তজ্জন্য তল্লিখিত মতামতে সাধারণের মতামত গঠিত হইয়া থাকে। এজন্য আমরা বিশ্বকোষ লিখিত মতামতগুলির প্রকৃত তত্ত্ব সাধারণের গোচরে আনয়ন করিতেছি।

প্রথমেই বিশ্বকোষে কৈবর্ত্তশব্দের যে ব্যুৎপত্তি লিখিত হইয়াছে তাহা ব্যাকরণ বিরুদ্ধ। বিশ্বকোষে লিখিত হইয়াছে কে জলে বর্ত্ততে = কেবর্ত্তঃ ততঃ স্বার্থে অণ যোগে কৈবর্ত্তপদ সিদ্ধ। এই প্রকার ব্যুৎপত্তি ব্যাকরণ অনুসারে সিদ্ধ হয় না। কারণ সোপপদ ধাতুর উত্তর পচাদ্যচ্ হইবার বিধি নাই।

আবার কে শব্দ সহ বর্ত্তঃ শব্দের অলুক্ সমাস ও হইতে পারে না। অলুক অধ্যায়ে কৃদন্ত বিধির নিয়ম এই যে কৃৎসূত্র দ্বারা সপ্তম্যন্ত উপপদের পরস্থ ধাতুর উত্তর প্রত্যয় বিহিত হইলেই সেই উপপদের সপ্তমীরই অলুক হয়। যথা কৃৎসূত্রে আছে সপ্তম্যাংজনের্ড়ঃ এই সূত্রে মনসিজঃ পদ সিদ্ধ হয়। যখন "কে—বৃত+অচ্ হইবার কোনই কৃৎসূত্র বর্ত্তমান নাই তখন সপ্তমীই বা কোথায়? তাহার অলুকই বা কিরূপে হইবে? অতএব কে জলে বর্ত্ততে ব্যুৎপত্তি অসিদ্ধ।

প্রকৃত প্রস্তাবে কিম্‌শব্দসহ অজন্ত বর্ত্ত শব্দের সমানাধিকরণ সমাস হইবার পর অণ্ যোগে কৈবর্ত্তপদ হইয়াছে। অতএব বৃৎ ধাতু অচ্ = বর্ত্তঃ, কিম্ বর্ত্তঃ = কিম্বর্ত্তঃ, কিম্বর্ত্তঃ + অণ্ = কৈবর্ত্তঃ। জগৎ বিখ্যাত সংস্কৃত জর্ম্মাণ অভিধান ১৭২৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ( বটলিঙ্ক ডিক্‌সনারী দ্রষ্টব্য। )

তারপর বিশ্বকোষে লিখিত হইয়াছে কৈবর্ত্তজাতি চলিত ভাষায় কেওত্ বা ক্যায়োট্ নামে পরিচিত। বঙ্গদেশে কেওত্ ক্যাওট্ চলিত ভাষা নহে, বঙ্গদেশে কেহ কৈবর্ত্তকে ক্যায়োট্ বলে না। ক্যায়োট্ জাতি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে বাস করে তাহারা বঙ্গীয় মাহিষ্যাপরনামা কৃষিকৈবর্ত্ত হইতে স্বতন্ত্র জাতি।

বিশ্বকোষে লিখিত হইয়াছে—"কৈবর্ত্তগণ আপনাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন জন্য বৃহৎ ব্যাস বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন।" শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন জন্য কোথাও বৃহৎ ব্যাস বচন উদ্ধৃত হয় নাই। মেদিনীপুরে প্রাপ্ত বৃহৎ ব্যাস সংহিতা যদি অপ্রামাণিক বলিয়া

পরিত্যক্ত হয় আমরা স্বচ্ছন্দে তাহা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য। কিন্তু মেদিনীপুরের বৃহৎ ব্যাস সংহিতার অনুরূপ গ্রন্থ কাশী ইত্যাদি স্থানে নাই। উহা পুরাণের ন্যায় বৃহৎ গ্রন্থ। বঙ্গদেশেও কাশ্যাদি স্থানে কোথাও বৃহৎ ব্যাসসংহিতা নামধেয় গ্রন্থ নাই। প্রচলিত বিংশ সংহিতার অন্তর্গত ব্যাসসংহিতা আছে মাত্র।

বিশ্বকোষে—

ক্ষত্রবীর্য্যেণ বৈশ্যায়াং কৈবর্ত্তঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
কলৌতীবর সংসর্গাদ্ধীবরঃ পতিতো ভুবি॥

শ্লোকের অর্থ লিখিত হইয়াছে "ক্ষত্রিয়ের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভে যে জাতি জন্মে তাহাকে কৈবর্ত্ত (ধীবর) বলে। কলিকালে ধীবর (কৈবর্ত্ত) পতিত হইয়াছে।" বিশ্বকোষ কর্ত্তা ঐ শ্লোকের কৈবর্ত্ত অর্থ ধীবর এবং ধীবর অর্থ কৈবর্ত্ত করিয়াছেন। উহা প্রকৃত অর্থ নহে) ঐ শ্লোকের প্রকৃত অর্থ "ক্ষত্রিয়ের বৈশ্যাপত্নীর গর্ভে যে জাতি জন্মে তাহাকে কৈবর্ত্ত বলে। কলিকালে তীবর সংসর্গে ধীবর জাতি পতিত। উদ্ধৃত শ্লোকের পূর্ব্বপংক্তির কৈবর্ত্তের পরিবর্ত্তে দ্বিতীয় পংক্তির ধীবর বসিতে পারে না। এরূপ বসিলে প্রয়োগে দোষ পড়ে। যেমন রাম উপাস্য রাঘবকে ভক্ত বলিলে রাঘব, রামেতর ব্যক্তি বলিয়া সন্দেহ আসে, তদ্রূপ কৈবর্ত্ত উৎপন্ন, ধীবর পতিত বলিলে প্রয়োগে দোষ পড়ে। মহামুনি ব্যাসদেবের এইরূপ প্রয়োগ জ্ঞান না থাকা অসম্ভব। এই কারণে স্পষ্টই উপলব্ধি হইতেছে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণোক্ত কৈবর্ত্ত শব্দের সহিত ধীবর শব্দের কোন সম্পর্ক নাই। শ্লোক পাঠে বুঝিতে পারা যায় এই ধীবর সত্যাদি যুগে পতিত ছিল না কলিকালে তীবর সংসর্গে পতিত হইয়াছে। এই প্রকার ধীবরের উৎপত্তি গৌতম সংহিতার ৪র্থ অধ্যায়ে দেখিতে পাওয়া যায়। এই জাতি বৈশ্যের ঔরসে ক্ষত্রিয়া গর্ভে উৎপন্ন প্রতিলোম জাতি। এই জাতি শাস্ত্রানুসারে স্পর্শাদি যোগ্য জাতি। এই জাতিরই তীবর সংসর্গে কলিতে পাতিত্য লিখিত হইয়াছে। যদি বলেন গৌতম সংহিতায় যার উৎপত্তি ব্রহ্মবৈবর্ত্তে তাহার পাতিত্য লিখিত হইবে কেন? তদুত্তরে দেখা যায় বৌধায়নে মদ্গু ও চুঞ্চু জাতির কথা লিখিত আছে। মনুতে এই দুই জাতির উৎপত্তির উল্লেখ নাই অথচ মনুতে মদ্গু ও চুঞ্চু জাতির বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যথা—চুঞ্চুমদ্গুনামারণ্য-পশুহিংসনম্। ইহাতেই দেখা গেল কেবল অমরকোষ লইয়া শাস্ত্রার্থের বিচার চলে না। অমরসিংহ কৈবর্ত্ত শব্দের সকল পর্য্যায় লিপিবদ্ধ করেন নাই। তিনি মনুপ্রোক্ত মার্গব শব্দকেও কৈবর্ত্তের পর্য্যায়রূপে গ্রহণ করেন নাই। যেমন দ্বিবিধ বৈদ্য, দ্বিবিধ করণ, তেমনি দ্বিবিধ কৈবর্ত্ত শাস্ত্রে ও ব্যবহারে বিদ্যমান আছে। মনুক্ত নৌকর্ম্মজীবী কৈবর্ত্ত অনাচরনীয়। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণোক্ত কৈবর্ত্ত দ্বিজাতির আচরণীয়। সুতরাং মাহিষ্য কৈবর্ত্ত সহ জালজীবী কৈবর্ত্তের গোল পাকান কর্ত্তব্য নহে।

অত্রি ও যম সংহিতায় কৈবর্ত্ত জাতি অন্ত্যজজাতির মধ্যে নির্দ্দিষ্ট হইলেও তাহাতে মাহিষ্য কৈবর্ত্তের কোন ক্ষতি নাই। কারণ কৈবর্ত্ত মাত্রই একজাতি নহে। এরূপ হইলে প্রসিদ্ধ কায়স্থ জাতিও অন্ত্যজ জাতি হইয়া পড়ে। ব্যাস সংহিতায়——

বর্দ্ধকানাপিতো গোপঃ আশাপঃ কুম্ভকারকঃ।

ইত্যাদি শ্লোক দ্রষ্টব্য। কল্পভেদে এক নামের জাতির মধ্যে উচ্চনীচ ভেদ থাকাতেই এইরূপ হয়।

বিশ্বকোষকার নানা কথা কাটাকাটির পর বলিয়াছেন ব্রহ্ম বৈবর্ত্তের কথা প্রকৃত হইলে এই কৈবর্ত্ত জাতি যাজ্ঞবল্ক্যের মাহিষ্য জাতি হইয়া পড়ে। এক্ষণে তিনি বিতণ্ডা উপস্থিত করিয়া বলিতেছেন "ব্রহ্ম বৈবর্ত্তের জাতি প্রকরণ প্রকৃত কি না?" তিনি ব্রহ্ম বৈবর্ত্ত অপ্রামাণিক বলিবার জন্ত বলিয়াছেন "ব্রহ্ম বৈবর্ত্তপুরাণের ব্রহ্ম খণ্ডে অতি নীচ জাতির বর্ণনা স্থলেই কৈবর্ত্ত জাতির কথা, তৎপর জোলা প্রভৃতি নীচ মুসলমান জাতির কথা আছে। জোলা কথাটি ব্রহ্ম বৈবর্ত্ত ব্যতীত অন্য কোন প্রাচীন গ্রন্থে নাই। মুসলমানগণ এদেশে আসিলে মুসলমান ও হিন্দু তাঁতির সম্মিলনে এই জোলা জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। এরূপ স্থলে ব্রহ্ম বৈবর্ত্তের যে অধ্যায়ে জাতি নির্ণয় বর্ণিত হইয়াছে তাহা প্রাচীন পুরাণের অংশ বলিয়া গ্রহণ করা যায় না।"

এক্ষণে কোষকারের উদ্ধৃত কথাগুলির সমালোচনা করা যাউক। ব্রহ্ম বৈবর্ত্তপুরাণের ব্রহ্মখণ্ডে উচ্চ নীচ সকল জাতির উৎপত্তি বর্ণিত আছে। একবার উচ্চ জাতি, তৎপরে নিম্ন জাতি বা মধ্য জাতি, আবার উচ্চ জাতি আবার নিম্ন জাতি বর্ণিত হইয়াছে। ভিন্ন স্বর্ণ-কারাদির পর করণ ও অম্বষ্ঠ জাতির উল্লেখ থাকায় ভিন্ন ও স্বর্ণকার অপেক্ষা করণ ও অম্বষ্ঠ নীচ জাতি হইবে কি? আবার কতকগুলি নীচ জাতির উল্লেখের পর রাজপুত্র, আগারি জাতির উল্লেখ করিয়া কৈবর্ত্ত জাতির উৎপত্তি লিখিত হইয়াছে। আবার কয়েকটী নীচ জাতির উল্লেখ করিয়া পুনর্ব্বার অশ্বিনী কুমার জাত বৈদ্যজাতির উৎপত্তি লিখিত হইয়াছে। এইরূপ উচ্চ নীচ জাতির উৎপত্তি একসঙ্গে লিখিত থাকায় উচ্চ জাতিগুলি নীচ জাতি হইয়া যাইতে পারে না।

তৎপরে জোলা শব্দ। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে আছে ম্লেচ্ছাৎ কুবিন্দ কন্যায়াং জোল জাতি বভূবহ। ম্লেচ্ছ অতি প্রাচীন জাতি। ম্লেচ্ছের উৎপত্তিও ব্রহ্ম বৈবর্ত্তপুরাণের ব্রহ্মখণ্ডে ও গরুড় পুরাণে আছে। ম্লেচ্ছ জাতির ভারতে বসবাস মহাভারতের সময় হইতে দেখা যায়। কুবিন্দ জাতিও অতি প্রাচীন জাতি। মিশ্রবর্ণের উৎপত্তিকালে উক্ত ম্লেচ্ছ ও কুবিন্দের সম্মিলনে জোল জাতির উৎপত্তি হওয়া অসম্ভব নহে। বিশ্বকোষ কর্ত্তা ম্লেচ্ছ অর্থে মুসলমান ধরিয়া গোলযোগ করিয়াছেন। মুসলমানের সহিত হিন্দু তাঁতির সম্মিলনে জোলা জাতির উৎপত্তি হইয়াছে ইহা নগেন্দ্রবাবুর অনুমান বা কল্পনা মাত্র। ব্রহ্ম বৈবর্ত্ত পুরাণের উক্ত জোল জাতি হিন্দু জাতি। ইহাদের বসতি এক্ষণে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে আছে।* শাস্ত্র অনুসারে ম্লেচ্ছ ও কুবিন্দ উভয়ই হিন্দু জাতি। তাহাদের সন্তানও হিন্দুজাতি। সম্ভবতঃ বঙ্গের জোল জাতির কতকাংশ মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে কতকাংশ অনাচরণীয় হিন্দু তাঁতিরূপে বর্ত্তমান আছে। আমাদের এই অঞ্চলে দুই জাতি তাঁতি বর্ত্তমান আছে, এক জাতির জল আচরণীয়

---

* মুরাদাবাদে উক্ত তন্তুবায়কে জুলাহে বলে, মুরাদাবাদ নিবাসী পণ্ডিত জ্বালা প্রসাদ মিশ্র প্রণীত জাতিনির্ণয় নামক পুস্তকের ৭০পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। জৌনপুরে হিন্দু জোলাকে "জরিয়া" বলে।

অন্ত জাতির জল অব্যবহার্য্য। অনাচরণীয় তাঁতিগণই সম্ভবতঃ জোলা তাঁতি। আবার বঙ্গের তন্তুবায় মধ্যে যাহারা মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া স্বীয় ব্যবসায় অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে তাহাদিগকে মুসলমানগণ তাঁহাদের উর্দ্দু ভাষায় ব্যবহৃত "জোল্হা" নামে ডাকিতেছেন। যেমন কোলও কোলা শব্দ সংস্কৃত তেমনি জোলও জোলা শব্দও সংস্কৃত। জোলা শব্দ জুল ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। জুলধাতুর অর্থ পেষণ। সংস্কৃত জোল শব্দের অপভ্রংশ হিন্দি বা পারসী জোল্হা হইয়াছে। সংস্কৃত ভাষার উন্নতির সময়ে বহুভাষায় এই ভাষার শব্দ গৃহীত হইয়াছিল। পক্ষান্তরে আবেস্তা ভাষা, আরবী প্রভৃতি বহু অনার্য্য ভাষা হইতেও সংস্কৃতের শব্দ সম্পদ বৃদ্ধি হইয়াছিল। সেই সকল শব্দের মূল নির্ণয়, কাল নির্ণয় ক্ষমতা বহুভাষাবিদ্ ভিন্ন অন্যের অসাধ্য। পিক শব্দ কোকিল অর্থে সংস্কৃতে ব্যবহার, অথচ ঐ শব্দটা আর্য্যভাষার শব্দ নহে। ঐরূপ তামরস শব্দটিও ম্লেচ্ছভাষা হইতে গৃহীত। পণ্ডিতগণ 'হোরা' শব্দটা গ্রীকভাষার শব্দ বলেন। অথচ প্রাচীন সংস্কৃত জ্যোতিষশাস্ত্রে হোরা শব্দের বহুল প্রয়োগ আছে, পিক তামরসাদি শব্দ যে ম্লেচ্ছ প্রসিদ্ধ তাহা জৈমিনি প্রণীত মীমাংসা দর্শনের "ম্লেচ্ছ প্রসিদ্ধ্যধিকরণ" নামক অধ্যায়ে আছে। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র নাথ দাস সঙ্কলিত বাঙ্গালা ভাষার অভিধানের পিক, তামরস ও হোরা শব্দ দ্রষ্টব্য।

মুসলমান জাতির সংসর্গে হিন্দু তন্তুবায় রমণীর গর্ভে যদি জোলা জাতি হইত এবং বঙ্গদেশের জাতির দিকে লক্ষ্য করিয়াই যদি ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের জাতিপ্রকরণ লিখিত হইত তাহা হইলে বোম্বে দ্রাবিড়, পঞ্জাব, কাশী, পুরী প্রভৃতি স্থানের ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের হস্তলিপিতে অবশ্য পাঠান্তর দৃষ্ট হইত। এবং ঐ ঐ স্থানের ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে ঐ জোলে জাতির বিবরণ থাকিত না। মুসলমান ত এ দেশে সেদিন আসিয়াছে।

পারসীতে বস্ত্র বয়নকারীর নাম বাফেন্দা, নুরবাক, আরবীতে হায়েক। যদি বস্ত্রবয়ন কারীর মুসলমানী নাম রাখা প্রয়োজন হইত তবে তাহার নাম বাফেন্দা, নুরবাক্ বা হায়েক হইত। জোল্হা শব্দ পারসীতে ব্যবহার হইলেও ঐ শব্দটা সংস্কৃত মূলক। পারসী ও সংস্কৃত ভাষার অনেক শব্দই একই মূল ধাতু হইতে উৎপন্ন। যেমন পিতৃ—পিতর, মাতৃ—মাদর, জোল—জোল্হা। পারসীতে পিতর, মাদর শব্দ থাকায় সংস্কৃত গ্রন্থগুলি যেমন মুসলমান আমলের হয় নাই তদ্রূপ জোল্হা শব্দ পারসী বা হিন্দিতে ব্যবহার হওয়া ব্রহ্মবৈবর্ত্তের জাতি প্রকরণ মুসলমান আমলের বা আধুনিক হইতে পারে না। সদৃশ শব্দের জন্য শাস্ত্র আধুনিক হয় না। মনুসংহিতায় "শৈখ" জাতির ( মনু ১০।২১ ) উল্লেখ আছে। আবার এতদ্দেশে বিপুল সংখ্যক "শেখ" সম্প্রদায়ের মুসলমান আছে। শেখ আরবী শব্দ, শৈখ সংস্কৃত শব্দ সিদ্ধান্ত বারিধি মহাশয়ের যুক্তি অবলম্বন করিলে মনুসংহিতাকেও মুসলমান আমলের বলিতে হয়।

নগেন্দ্র বাবু লিখিয়াছেন কোন কোন পণ্ডিতের মতে মনুপ্রোক্ত দাস নামক জাতি মূল কৈবর্ত্ত জাতি নহে। ইহারা গৌণ কৈবর্ত্ত মাত্র। এই মত অপনোদনের জন্য প্রাচ্য বিদ্যা-মহার্ণব সিদ্ধান্ত বারিধি মহাশয় বলিতেছেন যে "এখনও কৈবর্ত্ত জাতির মধ্যে অনেকে দাস-কৈবর্ত্ত বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন।" এই দাস উক্তি মার্গব বোধক নহে। মাহিষ্য-কৈবর্ত্তগণ কেন আপনাদিগকে দাস বলেন তাহার কারণ প্রদর্শিত হইতেছে। পাণিনি সূত্রে আছে—

দাস গোঘ্নৌ সম্প্রদানে।

৩। ৪। ৪৩

অর্থাৎ সম্প্রদান কারকে দাশ ও গোঘ্ন শব্দ নিষ্পন্ন হয়। দাশ অর্থে যাহাকে দেওয়া যায় অর্থাৎ যে জাতিকে করস্বরূপ কিছু না দিলে দেশে থাকা অসম্ভব হইত সেই জাতি দাশ-পদবাচ্য অর্থাৎ ক্ষত্রিয় জাতি বিশেষ। এই জন্যই যদুরাজগণ "দাশ" বলিয়া কথিত। এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দাশার্হ অর্থাৎ দাশদিগের শ্রেষ্ঠ। মাহিষ্য দাশগণ পিতৃকুল স্মরণে আপনাদিগকে দাশ বলেন। ইহাদের দাশোক্তি বা দাসোক্তি ক্ষত্রিয়ত্ব সূচক, ধীবরবাচক নহে।

বিশ্বকোষকার মাহিষ্যের কৃষিবৃত্তি খুঁজিয়া পান নাই। বিষ্ণুসংহিতায় অনুলোমজাতি মাতৃবর্ণে নিবিষ্ট হইয়াছে। অনুলোমাস্ত মাতৃবর্ণাঃ (বিষ্ণুসংহিতা) এই শাস্ত্র বাক্যে মাহিষ্য বৈশ্যজাতি হইতেছেন। বৈশ্যের ব্যবসায় কৃষি গোরক্ষা, বাণিজ্য, এ অবস্থায় মাহিষ্য মুখ্যবৃত্তি কৃষ্যাদি করিতে পারিবেন না কেন? কাজেই কুল্লুকভট্টের টীকায় পশুরক্ষা অর্থ কৃষিপরিগৃহীত হইয়াছে।

আবার ঔশনস ধর্ম্মশাস্ত্রে আছে—

নৃপাজ্জাতোহথো বৈশ্যায়াং গৃহ্যায়াং বিধিনাসুতঃ।

বৈশ্যবৃত্ত্যা তু জীবেত ক্ষত্রধর্ম্মং নচাচরেৎ।

কাশীবাসস্থ মহাদেব শাস্ত্রী প্রকাশিত

অষ্টাবিংশতিস্মৃতি ৩২৩ পৃষ্ঠা, তথা

বাচস্পত্যাভিধান ৩০৯৭ পৃষ্ঠা জাত শব্দ দ্রষ্টব্য।

ক্ষত্রিয়ের বৈশ্যাপত্নীর সন্তান বৈশ্যবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে, ক্ষত্রধর্ম্ম আচরণ করিবে না। এই উশনার নির্দ্দেশ মতে মাহিষ্যগণ বৈশ্যবৃত্তি অর্থাৎ কৃষি গোরক্ষা, বাণিজ্যাদি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে। সুতরাং মাহিষ্য ও ব্রহ্মপুরাণোক্ত কৈবর্ত্ত পিতামাতা ও বৃত্তি সাম্যে এক জাতি বটে। তবে স্কন্দ পুরাণে মাহিষ্যের জ্যোতিষ, শাকুন শাস্ত্র, স্বরশাস্ত্র প্রভৃতি জীবিকা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। এই সকল বৃত্তি সার্ব্বজনীন হইতে পারে না। বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির বৈকল্পিক বৃত্তি বটে।

হালিক কৈবর্ত্তগণ যে মিশ্রক্ষত্রিয় এবং ইহাদিগের মধ্যে যে বহুতর ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় অনুপ্রবিষ্ট তাহা নিম্নলিখিত শাস্ত্র বচনে প্রমাণিত হইতেছে।

১। মাগধায়াং বিশ্বস্ফটিক সংজ্ঞঃ অন্যান্ বর্ণান করিষ্যতি।

কৈবর্ত্ত-কটু-পুলিন্দ সংজ্ঞান্ ব্রহ্মণান্ রাজ্যে

স্থাপয়িষ্যত্যুৎ সাদ্যাখিল ক্ষত্রজাতিন্।

বিষ্ণুপুরাণ ৪।২৪।

২। মাগধানাং মহাবীর্য্যো বিশ্বস্থানি র্ভবিষ্যতি।

উৎসাদ্যপার্থিবান্ সর্ব্বান্ সোহন্যান্ বর্ণান্ করিষ্যতি।

কৈবর্ত্তান্ পঞ্চকাং শৈচব পুলিন্দান্ ব্রাহ্মণাংস্তথা।

স্থাপয়িষ্যন্তি রাজানঃ নানাদেশেষু তেজসা।

বায়ু পুরাণ। ৩৭ অঃ

৩। বিশ্ব স্ফানির রপতিঃ ক্লীবাকৃতি রিবোচ্যতে।
উৎসাদয়িত্বা ক্ষত্র বৈ ক্ষত্রমন্যং করিষ্যতি॥
বায়ু পুরাণ।

৪। মাগধানান্ত ভবিতা বিশ্ব স্ফূর্জ্জিঃ পুরঞ্জয়ঃ।
করিষ্যতি পরোবর্ণান্ পুলিন্দ যদু মদ্রকান্॥
ভাগবত ১২।১।৩৪-৩৫।

এই সমস্ত শ্লোকে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে কৈবর্ত্ত জাতি মিশ্র ক্ষত্রিয়। এবং পরবর্ণ অর্থাৎ দ্বিজবর্ণ। এবং কৈবর্ত্তের আর একটী নাম যদু। রাজপুতনাতে এই শাস্ত্রোক্ত কৈবর্ত্তগণ যদুনামে পরিচিত।

বিশ্বকোষ কর্ত্তা যবদ্বীপে মাহিষ্যের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। তিনি রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটির জর্ণালে মাহিষ্য নাম পাইয়াছেন। কিন্তু ঐ মাহিষ্য নামের পার্শ্বেই যে "কে'বো" নাম আছে তাহাতে তিনি মন দেন নাই। ঐ প্রমাণে স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে মাহিষ্য জাতিই কে'বো অর্থাৎ কৈবর্ত্ত। পাঠকগণের অবগতির জন্য ঐ স্থানটী অবিকল উদ্ধৃত করিলাম। রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটীর ৯ম খণ্ডে (১৮৭৭- ৭৮) যবদ্বীপের বিবরণে লিখিত আছে—

"The largest Kingdom in Java did not contain many Xatry-as ; they are called Mahisha or K'bo ( Buflalo to indicate their strength )"

যদি মাহিষ্যের কে'বো বা কৈবর্ত্ত নাম যবদ্বীপ হইতে পাওয়া যায় তবে আর কৈবর্ত্তের মাহিষ্যত্বে বিতণ্ডা কেন? তমলুকের মাহিষ্য কৈবর্ত্তগণই যবদ্বীপে মাহিষ্য ক্ষত্রিয়রূপে উপনিবিষ্ট। বাঙ্গালী কৈবর্ত্ত বিদেশে যাইয়া মাহিষ্য নাম অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন তজ্জন্য বাঙ্গালী গৌরব বোধ করিতেছেন কিন্তু স্বদেশে তাঁহাদের প্রতি সেই সম্মান দিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন কেন? আমরা অতঃপর নগেন্দ্রবাবু তদীয় বিশ্বকোষে মাহিষ্য শব্দে মাহিষ্য জাতি ও তৎ-পুরোহিতের প্রতি যেরূপ সাহিত্যিক অত্যাচার করিয়াছেন তাহাই প্রদর্শন ও খণ্ডন করিব। অলমিতি।

শ্রীসুদর্শনচন্দ্র বিশ্বাস।

---

# করুণা।

ভিজিয়ে দিয়ে বৃষ্টিধারে, কুঁচকে দিলে পাখা গো!
এযে গো করুণার কণা কন্‌কনে।
কেনই মোরে আকুল করে ওপার-পারে ডাকাগো?
শূন্যে কেন ধেয়ান করাও ও মনে?
শুকিয়ে ডানা রুদ্র রোদে, ঊর্দ্ধ পথের সুদূরে,
পালকেতে আলোক-রেখা ঝলিয়ে,

নীলের তীরের উদাস পুরে, বিশ্ব যেথা ধু-ধু-রে,
আমায় সেথা ভাসিয়ে দিব গলিয়ে।
বনের কোণের বাসাখানি থাকুগে ডালে পাতা সে।
গাছের পাতায় গাথা আমি শুন্‌বনা
ডাক মোরে! পাখা ঝেড়ে ভর করে যাই বাতাসে
করুণা গো! আমায় কর উন্মনা।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

# গয়ার ইতিহাস।

( পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর )

গয়াক্ষেত্র এবং তাহার একক্রোশের মধ্যে "গয়াশীর" অবস্থিত। অক্ষয় বটতীর্থের সন্নিকট প্রপিতামহেশ্বর শিবস্থান প্রভৃতি কতকগুলি তীর্থস্থান আছে; ফলকথা গয়াভূমি তীর্থ ময়া হইতেছে। গয়া শ্রাদ্ধ করিয়া গয়ালার নিকট হইতে সুফল লইয়া গয়াতীর্থের মধ্যেই ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে হয়। গৃহে গিয়া পুনশ্চ শ্রাদ্ধ করিয়া ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইতে হয়। ইহার পরই হউক বা তীর্থে ব্রাহ্মণ ভোজনের পূর্ব্বে "দেহরী" বাঁটিতে হয়, অর্থাৎ যজমান সাধ্যমত দক্ষিণা, ভোজন সামগ্রী পাত্রে দিয়া পৈতা চন্দন সিন্দুরাদি সহ তীর্থ-কল্পিত গয়ালীকে দান করিয়া গয়াপালগণের দ্বারে দ্বারে গিয়া ঐরূপ দান করিলে গয়াকার্য্য সর্ব্বাঙ্গীন সুসিদ্ধি লাভ করে।

গয়ার ভূতপূর্ব্ব সবজজ ৺বরদা প্রসাদ সোম মহাশয়ের "Old Gya and the Gayawals" নামক পুস্তক পাঠে গয়ালীদের সম্বন্ধে যথেষ্ট জানা যাইবে।

গয়াশ্রাদ্ধ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক বিচার মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্করত্ন এবং অতুল বাবুর "গয়া কাহিনী" গ্রন্থে বিশেষ ভাবে করিয়াছেন। অত্রিসংহিতা ৫৫-৫৮ শ্লোক, কল্যাণস্মৃতি ২৬খণ্ড, শঙ্খস্মৃতি ১৪ অধ্যায়, লিখিত স্মৃতি, যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি, মহাভারত বনপর্ব্ব, বাল্মীকি রামায়ণ, লিঙ্গ পুরাণ ৯৫ অধ্যায়, বামনপুরাণ ৯০ অঃ, বরাহপুরাণ ১৮৩ অঃ, মৎস্য পুরাণ ২২ অঃ, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ কৃষ্ণজন্ম খণ্ড, পদ্মপুরাণ সৃষ্টিখণ্ড, বায়ুপুরাণ ৪৩-৫০ অঃ অগ্নি পুরাণ ১১৫ অঃ, প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠে আমরা গয়াতীর্থ সম্বন্ধে যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতে পারি। অগ্নিপুরাণের ১১৫ অধ্যায় পাঠে আমরা জানিতে পারি যে কোন কোন তিথি ও দিনে পিতৃপিণ্ড দান গয়াক্ষেত্রে করিলে কি ফল লাভ হয়। শ্বেত বরাহ কল্পে ব্রহ্মা গয়ায় আসিয়া যজ্ঞ করিয়াছিলেন। সেই সময় তিনি চৌদ্দজন আচার্য্য ব্রাহ্মণ উৎপন্ন করিয়া গয়াকার্য্য শেষ করেন। এই চৌদ্দজন ব্রাহ্মণ বর্ত্তমান গয়াবাল বা গয়াপালগণের আদিপুরুষ হইতেছেন। ইঁহাদের নাম যথাক্রমে :—

| নাম | গোত্র | বেদ | উপ | শাখা | সূত্র |
|---|---|---|---|---|---|
| গৌতম | গৌতম | যজুর্ব্বেদ | ধনুর্ব্বেদ | মাধ্যন্দিনী | কাত্যায়ণ |
| কশ্যপ | কাশ্যপ | সাম | গান্ধর্ব্ব | কৌথুমী | গোভিল |
| কৌৎস | কৌৎস | যজুঃ | ধনুঃ | মাধ্যন্দিনী | কাত্যায়ন |
| কৌশিক | কৌশিক | „ | „ | „ | „ |
| কণ্বাব | কণ্বাব | „ | „ | „ | „ |
| ভারদ্বাজ | ভারদ্বাজ | „ | „ | „ | „ |
| ঊশনন | ঔশনন | „ | „ | „ | „ |
| বাৎস্য | বাৎস্য | „ | „ | „ | „ |
| পারাশর | পারাশর | যজুঃ | ধনু | মাধ্যন্দিনী | কাত্যায়ন |
| হরিৎকুমার | হরিৎকুমার | „ | „ | „ | |

| মাণ্ডব্য | মাণ্ডব্য | যজু | ধনু | মাধ্যন্দিনী | কাত্যায়ন |
|---|---|---|---|---|---|
| লৌগাক্ষি | লৌগাক্ষি | ঋক্ | অথর্ব্ব | আশ্বলায়ন | আশ্বলায়ন |
| বশিষ্ঠ | বশিষ্ঠ | যজু | ধনু | মাধ্যন্দিনী | কাত্যায়ন |
| আত্রেয় | আত্রেয় | " | " | " | " |

এই চৌদ্দ গোত্রীয় গয়াপাল ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কেবল কাশ্যপ, বাৎস্য এবং লৌগাক্ষি গোত্রীয়গণের শিখা এবং পাদ "বাম" হইতেছে এবং তাহাদের দেবতা "বিষ্ণু" হইতেছেন ব্রহ্মার সময় হইতে অদ্যাবধি গয়াপালগণ গয়াশীরে অর্থাৎ বিষ্ণুপদী মন্দিরের এক ক্রোশে মধ্যেই বাস করিতেছেন। আজ হইতে দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে গয়ায় চৌদ্দশত গৃহ গয়াপাল বাস করিতেন অথবা তাহারা চৌদ্দগোত্রীয় ব্রহ্মা কল্পিত ব্রাহ্মণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন বলিয়া তাঁহারা "চৌদ্দ সাহিয়া" বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে চৈনিক পরিব্রাজক হুয়েনসাঙ যখন গয়ায় আসিয়া তিন চান্দ্রমাস বাস করিয়াছিলেন, তখন তিনি তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্তে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন যে তিনি স্বচক্ষে গয়ায় একসহস্র ঘর গয়ালী বাস দেখিয়াছিলেন। অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে গয়া তুর্কী সৈন্যদের হাতে থাকে। তাহারা স্থানীয় হিন্দু অধিবাসীগণের উপর খুবই অত্যাচার করে। তাহাদের অত্যাচারে গয়াপালগণ বসবাস ছাড়িয়া কুর্কীহার, মনকোসী, পরেবা, ডভ্‌ছল্, মহাবোধ, পরোরিয়া প্রভৃতি গ্রামে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। মুসলমান ও তুর্কী সৈন্যদের অত্যাচারে গয়া মানবের বাস হীন হইয়া দাঁড়াইল এবং কোন যাত্রী এখানে ভয়ে আইসা যাওয়া করিত না। ১৪৪৬ সম্বৎ অর্থাৎ খৃষ্টিয় ১৩৮৯।৯০ সালে মহারাণা লক্ষ্মণসিংহ উদয়পুরের রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন তিনি তাতার ও তুর্কীগণের হস্ত হইতে গয়া নগরকে উদ্ধার করিবার জন্য সসৈন্যে আসিয়া গয়া অবরোধ করেন। দুইবৎসর অবরোধের পর সম্মুখ সংগ্রামে বীরোচিত ধর্ম্মপালন করিয়া মহারাণা ব্রহ্মলোকে প্রস্থান করিলে তাহার অধস্তন পঞ্চ পুরুষ পর্য্যন্ত বংশধরগণ হিন্দুর পরম তীর্থস্থান গয়া নগরকে উদ্ধারের চেষ্টা করিতে থাকেন কিন্তু তাহা ফলবতী হয় নাই; অবশেষে তাঁহার অধস্তন ষষ্ঠ বংশধর রাণাসঙ্গ ১৫০৯ হইতে ১৫২৮ সাল পর্য্যন্ত উদয়পুরের শাসন দণ্ড পরিচালন কালে গয়া নগরীকে তাতারীয়গণের কবল হইতে উদ্ধার করেন। এই ব্যাপার খানা আমাদের ভারতীয় "ক্রুসেড" বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, যে হেতু গয়াতীর্থ উদ্ধারের জন্য প্রায় এক শতাব্দী কাল হিন্দুগণ তাতারীয়গণের সহিত ঘোর যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত থাকেন। ভারত সম্রাট আওরঙ্গজেব ১৫৬৮ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিলে গয়ার অবস্থার কোন বিশেষ পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। তিনি ভারত ইতিহাসে আলমগীর বাদসাহ রূপে বিশেষ পরিচিত। তাঁহার ৫০ বৎসর ব্যাপী দীর্ঘ রাজত্ব কালে গয়ার গয়াপাল শ্রেষ্ঠ সীতারাম চৌধুরীর দুইপুত্র শোহর চন্দ্র এবং মোহর চন্দ্র চৌধুরীর মধ্যে জ্যেষ্ঠ শোহর চন্দ্র চৌধুরী দিল্লীতে বাদসাহের দরবারে গিয়া বহুদিন বাস করিয়া বাদশাহের কোন বেগমের প্রিয় পাত্র ও কৃপার দাস হইয়া সুযোগ পাইলে গয়াপালগণের উপর তুর্কী সৈন্যদের অত্যাচার কাহিনী জ্ঞাপন করিয়া কৃপাভিক্ষা করিলেন। তাহার সুযোগ এই রূপে ঘটে। বহুদিন চৌধুরীজী বাদসাহের দর্শন মানসে দিল্লীতে বসিয়া থাকেন, কোন মতেই রাজ সন্দর্শন ঘটে না। অবশেষে কোন

রূপ সুযোগ ক্রমে চৌধুরী শোহরচন্দ্র সম্রাটের প্রিয় বেগমের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। শোহর চন্দ্র যেমন দেখিতে সুপুরুষ যুবা তেমনি গুণালঙ্কৃত এবং যোদ্ধা পুরুষ। বেগম তাঁহাকে ডাকাইলে, তিনি কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই চৌধুরীজি অভিবাদন করিয়া মাতৃসম্বোধন করিয়া তাঁহার আমূল কাহিনী বর্ণন করিলেন। বেগম সাহেবা চৌধুরীজির ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে সাধ্যমত সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

একদা চৌধুরীজি বেগম সাহেবার সম্মুখে বসিয়া আছেন এমন সময়ে সম্রাট স্বয়ং সেইখানে আসিয়া পড়িলেন এবং অপরিচিত ব্যক্তিকে নিভৃত বেগমাবাসে দেখিয়া বেগমকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে এ ব্যক্তি কে? বেগম বলিলেন যে ইনি আমার সম্পর্কে পুত্র হন। বাদসাহ বলিলেন যে আমি উহাকে কিছু খাইতে দিলে খাইবে কি? বেগম বলিলেন জাঁহাপনা, আপনি ভারতের একচ্ছত্রী সম্রাট, সকলকেই ভোজন দিতেছেন। আমিও আপনার অন্নে পালিতা হইতেছি; আমার পুত্র আপনার দত্ত ভোজন গ্রহণ করিবে না কেন? নিশ্চয়ই সে খাইবে। বাদসাহ কিছু মিষ্টান্ন স্বহস্তে শোহরচন্দ্রকে দিলে তিনি ভোজন করিলেন। বাদসাহের মনের সন্দেহ ঘুচিল, সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন যে, পুত্র শোহরচন্দ্র কিছু যাচঞা কর, আমি তাহা দিব, আমি তোমার উপর বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছি। চৌধুরীজি কহিলেন জাঁহাপানা, যদি দীনের উপর এতই সন্তুষ্ট হইয়াছেন তবে এমন জিনিষ দিতে আজ্ঞা হউক যাহার দ্বারায় আমার পুত্র পৌত্রাদিগণ বংশানুক্রমে তাহার উপসত্ব ভোগ করিতে পারে। বাদসাহ বলিলেন, শোহরচন্দ্র তুমি আমার প্রিয় পুত্র, তোমাকে আমি চারি হাজার বিঘা জমি নিষ্কর জাইগীর গয়া সহরে দিলাম। এই সনন্দের নকল যথাস্থানে প্রদত্ত হইবে। বাদসাহ ফরমাস দিয়া ঐ জাইগায় চৌধুরীজিকে দখল করাইয়া দিলেন। প্রদত্ত জমীর চৌহদ্দী দক্ষিণে বৈতরণী পুষ্করিণী উত্তরে নাত্রাগঞ্জের পোল, পূর্ব্বে ফল্গু নদীর পূর্ব্বস্থ তীর এবং পশ্চিমে চিরাইঞ্জা টাঁড়। চৌধুরী মহাশয় গয়ায় ফিরিয়া আসিয়া অপর গয়ালীগণকে গয়ায় তাঁহার প্রদত্ত জাইগীর ভূমিতে প্রজাস্বরূপ আনাইয়া প্রজাস্বরূপ বাস স্থাপন করাইয়াছিলেন। চৌধুরী মহাশয় প্রাচীন গয়া নগরটীকে চারিটি তোরণ সংযুক্ত করিয়া নগরের চতুর্দ্দিকে খাই খনন করাইয়া দিয়া সুরক্ষিত করেন। চৌধুরী মহাশয় মুসলমান হইয়া গিয়াছিলেন বলিয়া তিনি স্বজাতিগণের নিকট হইতে পৃথক থাকিতেন; কিন্তু অপর গয়ালীগণ সর্ব্বদেশ হইতে যাত্রী সংগ্রহ করিয়া আনিতেন এবং চৌধুরী মহাশয়ের মালিকানা অংশ দিয়া যাত্রীর দ্বারায় নিজেদের জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। কিছুকাল পরে শোহরচন্দ্র চৌধুরী পরলোক গমন করিলে "ধৌত পদ" বেদীর সন্নিকটে তাঁহার "কবর" বা "সমাধি" নির্ম্মাণ করাইয়া দেওয়া হয়। শোহরচন্দ্র মুশলমান হইবার পূর্ব্বে তাঁহার এক বংশধর পুত্র শঙ্করলাল চৌধুরী এবং তাহার পরে বীরমা বা বীরমাতা নাম্নী এক পরমা সুন্দরী কন্যা জন্মগ্রহণ করে। শঙ্করলাল স্বজাতীয় উচ্চ গৃহের কন্যা পূর্ণাদাইকে বিবাহ করেন। ইনিই পরে পূর্ণা চৌধুরাণী নামে গয়ায় প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। পরোরিয়া গ্রামের "পড়ের" গয়ালী গৃহে বিরমার বিবাহ হয়। পূর্ণা চৌধুরাণী খুব সাহসী এবং স্বামীত্ব (masterful) সম্পন্না ও স্বাধীনচেতা স্ত্রীলোক ছিলেন; তিনি স্বয়ং সদা সর্ব্বদা রক্ষি গণে পরিবৃতা এবং অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিতা হইয়া থাকিতেন। তাঁহার অধীনে সাতশত পাঠান

রক্ষি সৈন্য সদা সর্ব্বদা আদায় তহশীল জন্য নিযুক্ত থাকিত। এই সময়ে বাদসাহের পক্ষ হইতে পাটনায় নবাব সাহ সুজা বজীর খাঁ শাসনকর্ত্তারূপে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। চৌধুরাণী মহাশয়া গয়ার সীমার মধ্যে মুশলমান থানার অবস্থিতি নিবারণ জন্য পাটনায় আবেদন করিলে শাসনকর্ত্তার পরামর্শক্রমে তাহা অগ্রাহ্য হইলে চৌধুরাণী মহাশয়-সমস্ত গয়াপালগণের সমবেত পরামর্শক্রমে, বাদসাহের গয়ার থানা জোরে উক্ত নগরের সীমার মধ্য হইতে উঠাইয়া দিলে বাদসাহের আদেশে উক্ত নবাব সুজাউজীর বাহাদুর চারিহাজার অশ্বারোহী এবং দুই হাজার পদাতী সৈন্যসহ চৌধুরাণীকে দমন করিবার জন্য স্বয়ং আসিয়া গয়া অবরোধ করিলেন। নবাব সুজাউজীর বাহাদুর নগরীটিকে পরিখা ও তোরণের উপর রক্ষির দ্বারা সুদৃঢ়রূপে রক্ষিত অবলোকন করিয়া গয়ার পূর্ব্বপ্রবাহী ফল্গুনদীর পরপারে "লক্ষ্মীবাগে" বাদসাহী থানার সন্নিকটে সৈন্য সমাবেশ করিয়া গয়াপালগণের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। সংবাদ পাইয়া নগর পালগণ এবং গয়াপালগণের প্রধান সেনানায়ক ভৈয়া গয়া সেন, চন্দন আহীর, জোহর হল, মিহির হল, কর্পূরা বারিক্ প্রভৃতি যোদ্ধাগণ নবাব বাহাদুরের সহিত গিয়া সাক্ষাৎ করিয়া প্রত্যেকে দশটাকা সিক্কাবাদসাহী টাকায় নজর দিয়া করজোড়ে হাজির্ থাকিলেন। নবাব গয়াপাল যোদ্ধাগণের দিকে দৃষ্টি করিয়া ভ্রাতা সম্বোধনে বলিলেন যে আপনারা কেন বাদসাহের থানা উঠাইয়া দিয়া তাঁহাকে অবমাননা করিয়াছেন! তাহাতে গয়াপালগণ বলিলেন যে আমরা বাদসাহের রাজভক্ত প্রজা, আমরা বিদ্রোহী নহি, আমাদের নিবাসস্থল গয়াশীরের মধ্যে মুশলমান থানা প্রতিষ্ঠিত থাকা আমাদের ধর্ম্ম বিরুদ্ধ, ইহার প্রতিকার করিতে আজ্ঞা হউক। সুবেদার বলিলেন যে তাহাই হইবে এবং তদনুসারে বাদসাহী থানা গয়া হইতে উঠাইয়া লইয়া লক্ষ্মীবাগে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হইল। এই ঘটনায় অল্পদিন পর গয়ালীগণ একযোট হইয়া চক্রান্ত করিলেন যে চৌধুরাণীজিকে আমাদের বহু কষ্টে অর্জ্জিত টাকার অধিকাংশ ভাগ দিতে হয়, অতএব চৌধুরাণীকে হত্যা করাই মত এবং তাহাই শ্রেয়ঃ। সকল গয়াপাল সমবেত হইয়া দেওনাপুরের বৈঠকে ঐ মর্ম্মে গুপ্ত মন্ত্রণা করিলেন। সকল গয়ালী মিলিত হইয়া চৌধুরাণীকে আমন্ত্রণ করিলেন। চৌধুরাণী অনেক ইতস্ততঃ করিয়া শেষে আমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন এবং স্বীয় বৈবাহিক নাগর চামরের বাটীতে যাইতে প্রতিশ্রুতা হইলেন। অবশেষে এক শুভদিনে চৌধুরাণী স্বীয় দেহ রক্ষিগণকে এবং সীতানাম্নী পরিচারিকাকে সঙ্গে লইয়া চতুর্দ্দোলায় আরোহণ করিয়া বৈবাহিক গৃহে গমন করিলেন। তিনি দোলা হইতে নামিবামাত্র বিশ্বাসঘাতী গয়ালীগণ চৌধুরাণীকে আক্রমণ করিয়া হত করিলে সীতাদাসী পলাইয়া গিয়া বীরমাকে খবর দিলে তিনি বহু বাছা সৈন্য লইয়া, স্বয়ং অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া অশ্বারোহণে গয়ালীগণকে স্বীয় মাতা চৌধুরাণীজির পাঠান সৈন্য সহ গয়াপালগণকে অবরোধ করিলেন। দেওনাপুর, উত্তর মানস, দক্ষিণ দরোজা, মুর্চ্চা, দেবঘাট, পাঁচ মহল্লা প্রভৃতি স্থানে খুব বড় বড় কয়টি উভয় পক্ষে যুদ্ধ হয়; তাহাতে বহু গয়ালী চমু হতাহত হন; দক্ষিণ দরোয়াজায় যুদ্ধে বিরমা নিজে বাম হস্তে আঘাত প্রাপ্তা হইলে মূর্চ্ছিতা হইয়া অশ্ব পৃষ্ঠ হইতে ভূতলে পতিতা হইলেন। তাঁহার বিশ্বাসী সৈন্যদের যত্নে চৈতন্য

সম্পাদিত হইলে তিনি সুস্থ হইয়া তিন দিন পরে পুনশ্চ প্রচণ্ড যুদ্ধ করিয়া সমস্ত গয়ালী সৈন্যকে পরাজিত করিয়া ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিলে, গয়ালীগণ পরাজয় স্বীকার করিয়া বীররমণী বিরমাকে পিতাম্বর দিয়া সন্ধি ক্রয় করিলেন। উভয়পক্ষের সন্ধির সর্ত্ত অক্ষয়বট তীর্থে লিখিত হয়; বিরমা অক্ষয়বট স্ব আয়ত্বে আনিয়া দখল করিয়া লইলেন। সন্ধির সর্ত্তমতে গয়াপালগণ চৌধুরাণীর পক্ষীয় পাঠান ও তুর্কী সৈন্যগণের কবর গয়ার মধ্যে নির্ম্মাণ করাইয়া দিলে বিরমা আদেশ করিলেন যে ইহার পর গয়ার সীমা মধ্যে কোন মুসলমান থাকিতে পারিবে না এবং কোন মুসলমান গয়ার মধ্যে "আজান" দিতে পারিবে না। এই আদেশ আজও প্রতিপালিত হইতেছে। পূর্ণা চৌধুরাণীর হত্যার পর বিরমা তাঁহার স্থানে উত্তরাধিকারী হইলেন। তিনি এই ব্যবস্থা করিলেন যে গয়ালীগণ যে যাত্রী গয়ায় আনয়ন করিবেন তাহার মধ্যে সাতজন আনয়নকারীর হইবে; তাহার উর্দ্ধ যাত্রীর অর্দ্ধেক বৃত্তি চৌধুরাণী এবং অর্দ্ধেক রোজগারী গয়ালীর হইবে। কিছুদিন পরে এই বন্দোবস্ত থাকিল না, কারণ অপরাপর গয়ালীগণ স্বতন্ত্র হইয়া পড়িলেন এবং চৌধুরী বংশে অপর কোন তেজস্বী লোক থাকিল না যিনি বাদসাহদত্ত নিজের স্বত্ব অক্ষুণ্ণ রাখেন। চৌধুরাণী বংশের শেষ অধিকারিণী পূর্ণাচৌধুরাণী হইতেছেন। ইনি অপুত্রক পরলোকগমন করিলে, তাঁহার দৌহিত্র ননকুমৌয়ার তাঁহার গদীর অধিকারী হন। পূর্ণা চৌধুরাণীর মৃত্যুর পর তাঁহার নিকটস্থ আত্মীয়গণ সমুদয় "চৌধুরীয়ানা" দখল করিয়া বসেন, নানকু বাবুর নিকট কোনরূপ কাগজপত্র ও সহায় সম্পত্তি ছিল না যে তিনি স্বীয় মাতামহের গদী উদ্ধার করেন। কোন উপায় না দেখিয়া তিনি গয়ার খ্যাতনামা ভূতপূর্ব্ব সরকারি উকীল বাবু উমেশচন্দ্র সরকারের শরণ লইলেন। উমেশ বাবু অত্যন্ত কষ্ট ও অমানুষী পরিশ্রম করিয়া তাঁহার যাবতীয় কাগজ পত্র উদ্ধার করিয়া তাঁহার মকর্দ্দমা গয়া আদালতে রুজু করেন। ননকু মৌয়ার বাবু কিশন লাল চৌধুরীর বিরুদ্ধে মোকর্দ্দমা রুজু করিলে উমেশ বাবুর চেষ্টা এবং তদ্বিরে তিনি এই মোকর্দ্দমা জেলা হইতে বিলাত প্রিভি কাউন্সিল পর্য্যন্ত লড়িয়া জয় করিয়া মাতামহের গদী উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। মকর্দ্দমা জয়ের পর ননকু মৌয়ার পারিশ্রমিক লইয়া উমেশচন্দ্র বাবুর সহিত তঞ্চকতা করিয়াছিলেন। ননকু মৌয়ারের পুত্র কানাই লাল মৌয়ার বহু দেনা পত্র করেন এবং নাচ, গান, বেশ্যাদিতে বহু অর্থ নষ্ট করেন। তাঁহার মত বিলাসী গয়ালী কম দৃষ্ট হয়। তাঁহার দেনায় তাঁহার সমুদয় সম্পত্তি বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। তাঁহার দুই পুত্র শ্যামজী ও রামজী মৌয়ার তাহার সম্বন্ধে গয়ার অন্যতম বিশিষ্ট গয়ালী রায় বাহাদুর বলদেব লাল নাক্ ফোফোর সহিত বাঁকীপুর হাইকোর্টে মকর্দ্দমা লড়িতেছেন। মৌয়ার ভ্রাতাদ্বয় গয়ার অন্তর্গত মহল্লা অন্দরপিণ্ডায় বাস করেন।

শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার।

---

# বড়দিনের অবকাশে।

বড় দিনের ছুটী উপলক্ষে কয়েকজন বন্ধু মিলিয়া গত ২৫শে ডিসেম্বর ১৯২১ রবিবার বেলা ১০টার সময় ভারতের পুণ্য তীর্থ রাজপুতনার কয়েকটি স্থান পরিভ্রমণে বহির্গত হইলাম। "আমেদাবাদের কংগ্রেসের" জন্য গাড়ীতে বড়ই ভীড়; কোনরকমে আমরা একটী কামরায় উঠিলাম—দেখিতে দেখিত গাড়ী ছাড়িয়া দিল—"বন্দেমাতরম্ ও গান্ধীমহারাজকী জয়" শব্দে ষ্টেশন মুখরিত হইতে লাগিল! গাড়ীর অধিকাংশ যাত্রীই আহমদাবাদের কংগ্রেসে যাইতেছেন। উহাদিগকে দেখিয়া মনে হইতেছিল কি যেন একটা আশা ও আকাঙ্ক্ষা লইয়া উহারা পুণ্যতীর্থ "আমেদাবাদে" যাইতেছেন। প্রায় সকলের মুখেই 'স্বরাজ' ও স্বদেশী আন্দোলনের কথা। দেখিতে দেখিতে বাস্পীয় যান দিল্লী আসিয়া উপস্থিত হইল।

জয়পুর যাইবার গাড়ী রাত্রি আটটার সময় সুতরাং আমরা আমাদের জিনিষগুলি রাখিতে জনৈক বন্ধুর বাড়ীতে গেলাম। জিনিষগুলি রাখিয়া "চাঁদনীর" বাজারের দিকে পদব্রজেই রওনা হইলাম। 'চাদনীর বাজার' কলিকাতার বড়বাজারের ন্যায়—নানাবিধ রমণীয় দোকানে সুসজ্জিত! বাজার দিয়া আসিতে আসিতে দেখিলাম রাস্তার দুইধারের 'ফুটপাথে' দুইদল লোক 'খদ্দর' হাতে করিয়া বলিয়া বেড়াইতেছে "হিন্দুমুসলমান ভাঁইয়ো 'খদ্দর' খরিদো গাড়া পাহিনোঁ—খদ্দর পহিনোঁ। মনে মনে ভাবিলাম—ধন্য মহাত্মা গান্ধী তোমারি ভেরীতে আজ হিন্দুমুসলমান অনুপ্রাণিত!

চাঁদনীর বাজার দিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র দিল্লীর ফোর্ট দেখাইবার জন্য আবদার ধরিল। দিল্লীর 'ফোর্ট' ও অন্যান্য স্থান অনেকবার আমি দেখিয়াছি, তবু নিত্যই তাহা নূতন বলিয়া মনে হয়! উহার "দেওয়ান আম" "দেওয়ান খাস্" ও "মতি মসজিদ্" দেখিলে যুগপৎ আনন্দ ও দুঃখের উদয় হয়। মনে হয়,—ভারত, তুমি কি সেই ভারত যে ভারতের শিল্পীগণ এই কারুকার্য্য-খচিত হর্ম্যগুলি নির্ম্মাণ করিয়াছিল!—এখন তোমার সে গৌরব কোথায় গেল?—কি পাপে তুমি এহেন সম্পদ হারাইয়াছ!

"ফোর্ট দেখা শেষ করিয়া আমরা রাত্রির আহারের জন্য "পাঞ্জাব হিন্দু হোটেলে" উপস্থিত হইলাম—বন্ধুরা আমিষ ভোজন একরূপ মন্দ করিলেন না, কিন্তু আমি হোটেলের নিরামিষ খাদ্য কোনরূপে গলাধঃকরণ করিলাম, এরূপ "ঝালে পোড়া" খাদ্য আমি আর কোন দিন আহার করি নাই! যাহা হউক, আমরা জিনিষগুলি লইয়া ষ্টেশনে পুনরাগমন করিয়া গাড়ীতে উঠিলাম। রাত্রি প্রায় সাড়ে তিনটার সময় গাড়ী জয়পুরে আসিয়া থামিল। অবশিষ্ট কয়েকঘণ্টা "ওয়েটিংরুমে" অপেক্ষা করিয়া প্রাতঃকালে ষ্টেশনের সন্নিকটে জয়পুর-মহারাজ কলেজের "প্রিন্‌সিপাল" শিক্ষাবিভাগের অধিনায়ক আমার বন্ধুবর মান্যবর শ্রীযুক্ত নবকৃষ্ণ রায়, বিএ, এক, আর, এস্, এল, (লণ্ডন) মহোদয়ের আতিথ্য গ্রহণ করিলাম। তাঁহার স্বাভাবিক সরলতা ও সৌজন্যে আমরা নিজেকে সৌভাগ্যবান্ বলিয়া মনে করিলাম।

কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম্ভালাপের পর তিনি আমাকে "বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ—মীরাট শাখার" কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম—"দেখুন আপনি এখানে (জয়পুর) চলিয়া আসা অবধি সাহিত্য পরিষৎ বড়ই মন্থর গতিতে চলিতেছে।" তিনি বলিলেন কেন, আপনারা সকলে মিলিয়া মিশিয়া ইহাকে রক্ষা করিবেন, উহাকে প্রবাসী বাঙ্গালীর একটি কীর্ত্তি বলিয়া মনে করিতে হইবে।"

আমরা জলযোগ সমাপন করিয়া জয়পুর ভ্রমণে বহির্গত হইলাম—গাড়ীতে উঠিবার পূর্ব্বেই নবকৃষ্ণ বাবু আমায় একখানি পত্রও চাপ্‌রাসী দিয়া বলিলেন, জয়পুরে যাহা দেখিবার স্থান আছে সে তাহা দেখাইয়া দিবে; আর এই চিঠিখানি চাপ্‌রাসীকে দিয়া "রাজবাটি", হইতে 'আমের দুর্গ' দেখিবার জন্য 'পাশ' লইয়া যাইবেন।" জয়পুরের শোভা সমৃদ্ধি অতুলনীয়, এ স্থান পর্ব্বতবহুল ও অতীব রমণীয়! এখানকার রাস্তা ও সৌধ নিচয় এরূপ সুশৃঙ্খলাবদ্ধ যে উহাকে আদর্শ মহানগরী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই নগরে গ্যাসের আলোক আছে। আলোক স্তম্ভের বিশেষত্ব এই যে ইহার প্রত্যেকটির উপরেই এক একটি ময়ূর মূর্ত্তি বিরাজমান। ইহা নাকি জয়পুরের রাজ চিহ্ন। নগরের প্রায় অর্দ্ধেক স্থান লইয়া বর্ত্তমান রাজপ্রাসাদ বিরাজমান। ইহার 'দেওয়ান আম' দেওয়ান খাস' এবং নানান্ বৃক্ষলতাদি পরিশোভিত পুষ্পোদ্যান বড়ই রমণীয়, কিন্তু বাগানের একটি স্থান দেখিয়া বড়ই দুঃখিত হইলাম। শুনিলাম, রাজা এই স্থানের মধ্য দিয়া চলিয়া যান আর নর্ত্তকীবৃন্দ দুইধারে নৃত্য করিতে করিতে তাঁহার সঙ্গে চলে! বর্ত্তমান বিংশশতাব্দীর মহালোকের যুগে এই বাদসাহী অনুকরণ কি আর শোভা পায়?

"গোবিন্দজীর মন্দির" রাজ বাটীতেই। মোগল সম্রাটের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার জন্য এই বিগ্রহ বৃন্দাবন হইতে আনীত হইয়াছিল। রাজ বাটীর মধ্যে একটী বৃহৎ পুষ্করিণী বিদ্যমান উহাতে কয়েকটি বৃহৎ বৃহৎ কুম্ভীর আছে, খাদ্য দিলে উহারা উপরে আসিয়া খাদ্য খাইয়া যায়। দুইটি চাকর আমাদিগকে বলিল যে আপনারা উহাদের খাদ্যের জন্য আট আনা পয়সা দিন এখুনি কুম্ভীরগণকে ডাকিয়া খাওয়াইয়া দিই। আমরা পয়সা দিলাম, উহারা মাংস আনিয়া কুম্ভীরগণকে ডাক দিল; আর অমনি সাত আটটী কুম্ভীর আসিয়া উহাদের নিকট হইতে মাংস খাইতে লাগিল! ভাবিলাম, এ হেন হিংস্র জন্তুও পোষ মানিয়াছে। হিংসা ত্যাগ করিয়া ভাল বাসিতে পারিলে সকলকেই বশীভূত করিতে পারা যায়।

যাহা হউক আমরা রাজপ্রাসাদ দেখা শেষ করিয়া ইতিহাস প্রসিদ্ধ "আমের দুর্গ" দেখিতে গাড়ীতে উঠিলাম—আমের যাইবার পথে দুই পার্শ্বে প্রাচীন সহরের ধ্বংসাবশেষ বর্ত্তমান। আমের দুর্গ পর্ব্বোতপরি সংস্থিত; আরাবলি পর্ব্বতের গিরি শ্রেণী দ্বারা পরিবেষ্টিত। প্রায় আধ ঘণ্টাকাল সোপানাবলী অতিক্রম করিয়া "আমের দুর্গের" উপরে উঠিলাম—দুর্গের মধ্যে "দেওয়ান আম" "দেওয়ান খাস্" "সীশ মহল" প্রভৃতি স্থান গুলি মোগল দিগের অনুকরণে রচিত। প্রাসাদের প্রায় সমুদয় অংশই শ্বেত প্রস্তরে নির্ম্মিত। বঙ্গদেশ বিজয় করিয়া মহারাজ মানসিংহ যে যশোরেশ্বরী দেবীমূর্ত্তি লইয়া আসিয়াছিলেন তাহাও বিরাজমানা। দেবীর নিকটে একটি খড়্গ দেখিলাম। শুনিলাম ঐ খড়্গদ্বারা নিত্য একটি করিয়া অজমুণ্ড বলি দেওয়া

হয়। হায় বাঙ্গালা, নিরীহ জীবের প্রতি তোমার এই অমানুষিক অত্যাচার সুদূর রাজপুতানায়ও বর্ত্তমান!!

শুনিলাম, পূর্ব্বে মহারাজ এ দুর্গে মধ্যে মধ্যে আসিয়া বাস করিতেন। এখন দশবৎসর যাবৎ আর আসেন নাই। আরাবলি পর্ব্বতবেষ্টিত এই দুর্গম ও দুর্ভেদ্য দুর্গ দেখিয়া মনে হইল "ওহো কাল তুমি কি কুটিল। তোমার নিকট সকলেই পরাস্ত। এই আমের দুর্গ যাহা এক সময়ে মোগল সম্রাটের ও চক্ষুঃশূল হইয়া উঠিয়াছিল, আজ তাহা জন মানব বিহীন অরণ্যে পরিণত হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না!! হায় মান সিংহ! পাদশাহ আকবরের পক্ষ সমর্থন করিয়া কত নগর নগরী তুমি ধ্বংশ করিয়াছিলে —আর আজ তোমারই সাধের আমের দুর্গের এরূপ শোচনীয় অবস্থা! স্বদেশ ও স্বজাতিদ্রোহিতার ফল যে কিরূপ ভীষণ তাহার সাক্ষ্য দিবার জন্যই কি আমের দুর্গ এই ভাবে দাঁড়াইয়া আছে?

আমরা ক্ষুণ্ণ মনে সহরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। এখানকার 'মহারাজ কলেজ' সংস্কৃত কলেজ 'ডাক্তারখানা' 'হাওয়াই মহল' 'কাউনসিল হাউস' প্রসিদ্ধ 'রামবাগস' ও 'আজবঘর' দেখিলাম। যখন রামবাগে প্রবেশ করি এই সময় মনে হইতেছিল, যেন আমরা স্বপ্নের দেশে প্রবেশ করিতেছি! ভারতের অনেক স্থান পরিভ্রমণ করিয়াছি, কিন্তু "রামবাগের" ন্যায় পুষ্পোদ্যান আর দেখি নাই। সহর দেখিয়া মনে হইল যে মিউনিসিপ্যালিটির সুবন্দোবস্ত আছে। জয়পুরের বাড়ীগুলির একটি বিশেষত্ব এই যে উহা প্রস্তরে নির্ম্মিত এবং জানালাগুলি খুব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র। সহর পরিভ্রমণ করিয়া সন্ধ্যার সময় আমরা ফিরিয়া আসিয় নবকৃষ্ণ বাবুর বাড়ীতে চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য পেয় সমাপন করিয়া রাত্রি আটার গাড়ীতে আজমীঢ় রওনা হইলাম। নবকৃষ্ণ বাবু ও তাঁহার স্ত্রী ও কন্যার আদর যত্ন ও অভ্যর্থনা আমরা জীবনে ভুলিতে পারিব না!

আজমীঢ় রাত্রি ১২টার সময় পঁহুছিয়া আমরা শেঠদিগের হিন্দু হোটেলে আশ্রয় লইলাম। পরদিন প্রাতঃকালে হিন্দুর মহাতীর্থ পুষ্কর রওনা হইলাম। আজমীঢ় হইতে পুষ্কর প্রায় ৭৷৷০ মাইল পথ। আরাবলী পর্ব্বতের মধ্য দিয়া যাতায়াতের পথ। বর্ত্তমান সময়ে ইংরাজ রাজ প্রায় এক মাইল পাহাড় কাটিয়া নূতন পথ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন, ইহাতে যাতায়াতের বড়ই সুবিধা হইয়াছে। এ কারণ ইংরাজরাজ আমাদের ধন্যবাদের পাত্র আমরা টঙ্গা করিয়া প্রায় দুই মাইল গিয়াছি এমন সময়ে ঘোড়া দুইটি বিগড়াইয়া গেল। সুতরাং বাধ্য হইয়া "টঙ্গা" ছাড়িয়া দিয়া আমরা পদব্রজেই এই পার্ব্বত্য পথ অতিক্রম করিতে লাগিলাম— কি অপূর্ব্ব দৃশ্য! কোথাও অতি উচ্চ, কুত্রাপি বা অতি নিম্ন! কোন স্থানের গিরি কন্দর এত গভীর যে তাহা ধারণাই করা যায় না। কোথাও মৃণ্ময় প্রস্তর পুঞ্জ স্তুপাকার, আবার কোথাও কঠিন কৃষ্ণকায় প্রস্তর সমূহ উন্নত মস্তকে দণ্ডায়মান হইয়া যেন পথিকদিগের মনে ভীতি প্রদর্শন করিতেছে! কুত্রাপি বা উপত্যকা, কোথাও মনোহর অধিত্যকারাজী তদুপরি গো, গর্দ্দভ, মহিষ, হরিণ ও হনুমানগণ চরিয়া বেড়াইতেছে। এখানকার বন্য ময়ূরগণ নিঃশঙ্ক চিত্তে সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেছে! কারণ কেহই উহাদিগকে হিংসা করে না। প্রায় দুই মাইল

পথ অতিক্রম করিয়া আমরা উপত্যকার ভিতর দিয়া সোজা রাস্তায় চলিতে লাগিলাম—, চতুর্দ্দিকেই সুন্দর প্রসারিত আরাবলী পর্ব্বত শ্রেণী, যেন আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই পুষ্কর যাইতেছে! আমরা এই ভাবে প্রকৃতির সৌন্দর্য্য দর্শন করিতে করিতে মহাতীর্থে উপনীত হইলাম। পুষ্করের শোভা বর্ণনা করা অসাধ্য!! এখানে একটি হ্রদ আছে এবং ইহাতে কয়েকটা বৃহৎ বৃহৎ কুম্ভীর ও বাস করে। যাঁহারা পুষ্করে যান তাঁহারা এই হ্রদে স্নান করেন। জল বড়ই অপরিষ্কার, উহাতে স্নান করিতে আমার ন্যায় মহা পাপীরও প্রবৃত্তি হইল না; কিন্তু, কি করি পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়াছি, শরীর ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে, অনিচ্ছাসত্বেও স্নান করিব বলিয়া স্থির করিলাম। প্রথমে, বন্ধুবর্গ স্নান করিলেন। পাণ্ডা মহাশয় 'স্নানের-মন্ত্র' পাঠ করাইলেন—আমি নিকটে দাঁড়াইয়া শ্রবণ করিতেছিলাম। পাণ্ডা মহাশয় এরূপ পণ্ডিত যে, "স্নানের মন্ত্র" পাঠ করাইতে গিয়া দুইটি ভুল করিয়া বসিলেন। অহো! কি অধঃপতন। ইহাদের হাতেই আমাদের ধর্ম্ম-কর্ম্ম! বন্ধুদের স্নান হইলে, আমি স্নানে নামিলাম, পাণ্ডা মহাশয়কে বলিলাম যে আমাকে মন্ত্রপাঠ করাইতে হইবে না, আমি নিজেই পাঠ করিতেছি। ইচ্ছা ছিল, মহাতীর্থ পুষ্করে পূজাপাদ পিতৃপুরুষদিগের নামে ভক্তির ও শ্রদ্ধাঞ্জলির চিহ্ন স্বরূপ একটি পিণ্ডদান করি, কিন্তু, এরূপ মূর্খ পাণ্ডাদিগের দ্বারা কার্য্য করাইতে প্রবৃত্তি হইল না। প্রায় সকল তীর্থের পাণ্ডাদিগের এই দুর্দ্দশা অথচ ইহা সংস্কারের চেষ্টা সনাতনী হিন্দু ভ্রাতাদিগের নাই। এই সকল মূর্খ পাণ্ডাদিগকে শিক্ষা দীক্ষায় সমুন্নত করা কি হিন্দুসমাজের নেতৃবৃন্দের কর্ত্তব্য নহে? আমরা স্নানান্তে কিছু জলযোগ করিয়া 'সাবিত্রী' দর্শনাভিলাষে বহির্গত হইলাম। "সাবিত্রী পাহাড়" পুষ্কর হইতে প্রায় ৩ মাইল পথ—।০ মাইল বালুকাময় পথ অতিকষ্টে অতিক্রম করিয়া আমরা সাবিত্রী পাহাড়ে উঠিতে লাগিলাম! প্রায় দেড়ঘণ্টাকাল 'খাড়াই' উঠিয়া গলদ্‌ঘর্ম্ম হইতে হইতে উপরে উঠিলাম। সাবিত্রীদেবী দর্শন করিয়া, উপর হইতে পুষ্করের অপূর্ব্ব শোভা দেখিয়া বিস্ময়ে মগ্ন হইয়া গেলাম। কিছুক্ষণ পরে টঙ্গা আসিল। আমরা দুই ধারে পর্ব্বতের অপূর্ব্ব শোভা দেখিতে দেখিতে আজমীঢ়ে ফিরিলাম। প্রায় সাড়ে পাঁচটায় আমরা আজমীঢ়ে 'পীরের দরগায়' উপস্থিত হইলাম। একজন প্রদর্শক আমাদিগকে লইয়া উহার অভ্যন্তরের স্থানগুলি দেখাইতে লাগিল—'গেটের' পার্শ্বে দুইটি বৃহৎ কটাহ—শুনিলাম এই দুই কটাহে পর্ব্বদিনে সময়ে সময়ে অন্ন প্রস্তুত হয়। একটিতে ১২০ মণ আর একটিতে ৬০ মণ চাউলের অন্ন প্রস্তুত হয়!! লোকেরা উহা যথেচ্ছভাবে আহার করে। তৎপর "পীরের মসজিদের" নিকট উপনীত হইলাম। প্রদর্শক বলিল এখানে "পীরের সিন্নি" দিতে হইবে, উহা না দিলে মসজিদের ভিতর প্রবেশ করিতে পারা যাইবে না। কি করি অনিচ্ছাসত্বেও পাঁচ সিকার সিন্নি দিলাম! মসজিদের মধ্যভাগ স্বর্ণ ও রৌপ্যের কারুকার্য্য খচিত বহুমূল্য দ্রব্যে সুশোভিত। আমাদের ঠাকুরের মন্দিরের ন্যায় ধূপ, ধুনা, গুগ্‌গুল নানান্ পুষ্পসৌরভে ঘরটি আমোদিত ও সুবাসিত! বহুসংখ্যক মুসলমান করযোড়ে হাঁটু গাড়িয়া পীরের কবর স্থানটিতে প্রণাম করিতেছে। প্রদর্শক বলিল, "তোমরা এখানে হাঁটু গাড়িয়া উহাকে প্রণাম কর এবং কিছু "দর্শনী দাও, ইনি সাক্ষাৎ দেবতা! দেখিয়া

আমি 'হতভম্ব' হইয়া গেলাম ॥ ভাবিলাম "হে মহাত্মা মহম্মদ তুমি না একদিন পৌত্তলিকার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলে?—আর আজ তোমারি মসজিদে এ কি দেখিতেছি! ইহা কি পৌত্তলিকতার প্রশ্রয় নহে? তোমার মসজিদের মধ্যে "দর্শন." না দিয়া প্রবেশ করিতে পারা যায় না জীবনে এই প্রথম দেখিলাম। হিন্দুর কালীঘাটে যেমন "দর্শনী" ব্যতীত প্রবেশ নিষেধ এই পীরের 'দরগায়'ও সেই অবস্থা ॥ পরদিন প্রাতঃকালে আমরা আজমীঢ়ের অন্যান্য স্থান পরিভ্রমণে বহির্গত হইলাম। আজমীঢ় ইংরাজের খাস দখলে। ইহা অতি সুরম্য নগর। নগরটিকে আরাবলী পর্ব্বতমালা যেন ক্রোড়ে করিয়া বসিয়া আছে। দক্ষিণ-পশ্চিমকোণে পর্ব্বতোপরি মহারাজ পৃথিরাজের কেল্লা। স্বনাম ধন্য মহারাজ অজামীল এই নগরের প্রতিষ্ঠাতা এবং মহারাজ পৃথিদেব এখানে বহুকাল রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। রামপুরের মুসলমান নবাব আড়াই দিন ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া ইহা হিন্দুদিগের হস্ত হইতে কাড়িয়া লইয়াছিলেন। এখানে মহাত্মা বাদসাহ আকবরের সময়ের বহু প্রস্তর নির্ম্মিত সৌধ বর্ত্তমান। তন্মধ্যে 'আনাসাগর' তীরবর্ত্তী 'বারদরিয়া' গৃহাবলী উল্লেখযোগ্য।

এখানকার "জৈন মন্দির" ও "রাজকুমার কলেজ" দেখিবার জিনিষ। "রাজকুমার কলেজ" শ্বেতপ্রস্তরে নির্ম্মিত, এরূপ সুরম্য ভবন ভারতে অতি বিরল! শুনিয়া সুখী হইলাম যে "দেশীয় রাজ্যের" ন্যায় আজমীঢ়ে গো হত্যা হয় না। আমরা আজমীঢ় দেখিয়া ঐ দিবসেই রাত্রি দশটার ট্রেনে রাজপুতানার গৌরব—ভারতের গৌরব-'চিতোর গড়' যাত্রা করিলাম। পরদিন প্রাতঃকালে আমরা 'চিতোর গড়' ষ্টেশনে পহুছিলাম, ও নিকটস্থ একটি সরাইয়ে আশ্রয় লইলাম। সরাইয়ের মালিক রেলের সামান্য চাপরাসী মাত্র। শুনিলাম, ষ্টেশন হইতে তিন মাইল পথ যাইলে তবে আমরা চিতোর দুর্গ আরোহণ করিতে পারিব। চাপরাসী আমাদের সঙ্গে একটি লোক দিল। উহাকে লইয়া দুর্গের পথে চলিলাম। আরাবলী পর্ব্বতের একটি স্বতন্ত্র শাখার উপরে চিতোর দুর্গ বর্ত্তমান। একটি ক্ষুদ্র নদী উহাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। ক্রমে ক্রমে আমরা ছয়টি সিংহদ্বার পার হইয়া প্রায় এক ঘণ্টা পরে দুর্গের উপরে উঠিলাম। উঠিয়াই পুণ্যতীর্থ চিতোরের ধূলিকণা মস্তকে ধারণ করিলাম। প্রথমেই অন্নপূর্ণার মন্দির দেখিয়া 'চারভুজ' (চতুর্ভুজ) দর্শন করিলাম। তৎপরে মীরাবাইয়ের নির্ম্মিত মন্দির ও তাহাতে রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তি দেখিয়া "কালকা দেবীর" সমীপে উপনীত হইলাম। মূর্ত্তিটি শ্বেত প্রস্তরের, এই স্থানেই চিতোরের সহস্র সহস্র বীরগণ মাতৃভূমি রক্ষার জন্য যুদ্ধ সজ্জায় সজ্জিত হইয়া মার চরণে পূজা দিতে আসিতেন। হায়! সেই একদিন আর এই একদিন! এখন মার সেই বীর পুত্রগণ চিরদিনের জন্য কাল-কবলে কবলিত হইয়াছেন আর শক্তিরূপিণী মাও অন্তর্দ্ধান হইয়াছেন। এখন কেবল প্রস্তর 'মূর্ত্তি বিরাজমানা। তারপর, আমরা "কুম্ভরাণার স্তম্ভ" দর্শন করি; দিল্লীশ্বরকে উপর্য্যুপরি পরাজিত করিয়া ভারতভূষণ বীরেন্দ্রকেশরী কুম্ভরাণা এ স্তম্ভটি নির্ম্মাণ করেন। স্তম্ভটি নয়টি প্রকোষ্ঠ দ্বারায় নির্ম্মিত। স্তম্ভের গাত্রে দেব, দেবীর অসংখ্য মূর্ত্তি খোদিত; কিন্তু অধিকাংশ মূর্ত্তি বিকৃত অবস্থা, দেখিলেই মনে হয় দুষ্টেরা দুর্গজয়কালে ঐরূপ বিকৃত আকার করিয়া

দিয়াছে! তৎপর, আমরা একটি পরম রমণীয় স্থানে উপস্থিত হইলাম স্থানটির নাম 'গোমুখী'—একটি প্রস্তর নির্ম্মিত সরোবর—একটি নির্ঝর ধারা প্রবাহিত হইয়া সরোবরে পড়িতেছে। পূর্ব্বে আর একটি নির্ঝর ধারা ছিল তাহা এখন বন্ধ হইয়া গিয়াছে। স্থানটী যেমন মনোহর তেমনি সুশীতল। রাজপুরী হইতে একটী গুপ্ত পথ পর্ব্বতের মধ্য দিয়া এইখানে আসিয়াছে। রাজমহিষীরা এই সুরঙ্গ পথ দিয়া এখানে স্নান করিতে ও দেব দেবীর পূজা করিতে আসিতেন। শুনিলাম এই পথের সঙ্গে আর একটি সুড়ঙ্গ পথ আছে; সেইখানে সহস্র সহস্র বীর রাজপুত রমণীরা তাহাদের অমূল্যনিধি সতীত্ব রক্ষার জন্য জ্বলন্ত আগুনে ঝাঁপ দিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়া গিয়াছেন। ভক্তিভরে ঐ স্থানটার উদ্দেশে প্রণাম করিলাম। এইবার আমরা ললনাকুল ললামভূতা আমাদের ভারত ললনার আদর্শ স্থানীয়া মাতা পদ্মিনীদেবীর আবাসস্থানে উপস্থিত হইলাম। যে সৌন্দর্য্যের প্রতিবিম্ব মাত্র দর্শন করিয়া দিল্লী উন্মত্ত হইয়া চিতোর ধ্বংশ করিয়াছিল এ সেই মার মন্দির। মন্দিরে প্রবেশ করিয়া উহার ধূলিকণা মস্তকে ধারণ করিলাম। অট্টালিকাটী খুব বৃহৎ না হইলেও যেন ছবির মত, উহার শিরোদেশে চারিটি স্ফটীকের নক্ষত্র—সূর্য্য কিরণে ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছে। শুনিলাম, ঐগুলি সতীত্বের স্মৃতি চিহ্নস্বরূপ! এই অট্টালিকার পার্শ্বে একটী সুন্দর সরোবর—মধ্যে একটি দ্বিতল গৃহ। এইখানেই পদ্মিনীদেবী ক্রীড়া করিতেন। চিতোর দুর্গ উত্তর দক্ষিণে প্রায় ৩৷০ মাইল দীর্ঘ এবং এক মাইল সমতল ভূমি, স্থানে স্থানে বৃহৎ বৃহৎ জলাশয় রহিয়াছে। চিতোরের ধ্বংশাবশেষ দেখিয়া মর্ম্মাহত হইয়া ভাবিলাম—এই পূণ্য তীর্থ যদি ইংরাজ বা অন্য কোন পাশ্চাত্য জাতির হইত তাহা হইলে আজ এই ধ্বংশাবশেষের চিহ্নগুলি কিরূপ সুরক্ষিত থাকিতে দেখিলাম। যে চিতোরের রাণা প্রতাপসিংহ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে যতদিন না দিল্লী জয় করিয়া আবার চিতোর অধিকার করিতে পারেন ততদিন তৃণ ভিন্ন অন্য শয্যায় শয়ন করিবেন না, পত্র ভিন্ন অন্য কোন পাত্রে আহার করিবেন না, আজ তাঁহারই বংশ প্রসূত রাণাগণ জীবিত থাকিতেও চিতোর অরণ্যানীতে পরিণত—শৃগাল কুক্কুরের আবাসভূমি! পূর্ব্বপুরুষদিগের কীর্ত্তিগুলি সযত্নে রক্ষা করিতেও ইহারা পরাঙ্মুখ। ধন্য দেশীয় রাজা! রাজপুতনার শেষ গৌরব ভারতের শেষ সূর্য্য চিতোর গড় দেখিয়া ভগ্নহৃদয়ে সেই দিবসেই আমরা মারাট ফিরিবার জন্য যাত্রা করিলাম।

শ্রীললিতমোহন রায়।

---

# মরণ-পুলক।*

মরণ তোর দুয়ারে এসে
দিচ্ছে হানা,
ফুটবে আলো আঁধার শেষে
যাচ্ছে জানা!

ওরে ও মন! নাচরে আজি
পুলকে—
প্রাণের মেলা বসবে বুঝি
দ্যুলোকে!

---

* কবিতাটি প্রেসে দেওয়ার পর কবি অকালে মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন।

ধরার খেলা অনেক ছল
অনেক মতে,
দীর্ঘ-নিশা কাট্‌ল শুধু
অচিন্‌-পথে।
কোথায় ছায়া একটুখানি
জুড়া'তে,—
বিরাম কোথা একটুখানি
ঘুমা'তে।
বিরাট ছায়া আস্‌ছে নামি
আজকে অই,—
ইচ্ছা-সুখে ঘুমাবি তুই
নিঝুম হই'।

সকল দুখ-বিষাদ-ব্যথা
পাশরি'
বাজ্‌বে চিতে নব জীবন-
বাঁশরী!
মরণ-সুখে সুধীরে তুই
নাচ্‌ রে মন!
তরুণ উষা উঠছে হাসি'
কর্‌ বরণ!
এবার নয় ছলনা শুধু
স্বপনে,—
অশ্রু যে গো শুকিয়ে এল
নয়নে।

শ্রীজীবেন্দ্র কুমার দত্ত

---

# মহাভারত মঞ্জরী।

## বনপর্ব্ব।

### দ্বিতীয় অধ্যায়।

মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ও মহাত্মা বিদুর।

পাণ্ডবেরা বনে গিয়াছেন, তাঁহাদের বিশাল সাম্রাজ্য, অতুল ঐশ্বর্য্য, সকলই রাজা ধৃতরাষ্ট্রের হস্তগত হইয়াছে, তথাপি তাঁহার প্রাণে শান্তি নাই, রজনীতে নিদ্রা নাই। শুধু ঐশ্বর্য্যই কি লোককে সুখী করিতে পারে? একদিন তিনি সভামধ্যে বিদুরকে বলিলেন, "তুমি মহাপ্রাজ্ঞ, যাহাতে কুরুপাণ্ডবের হিত হয়, তাহাই বল।"

বিদুর উত্তর করিলেন, "রাজন্‌, আপনি ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী হউন, লোভের বশবর্ত্তী হইবেন না। কারণ লোভ হইলে অতি বুদ্ধিমানেরও বুদ্ধির লোপ হয়। পাণ্ডবদিগের রাজ্য ফিরাইয়া দিন, নচেৎ নিশ্চয়ই যুদ্ধ বাধিবে, নিশ্চয়ই কুরুকুল বিনষ্ট হইবে।"*

তাহা শুনিবামাত্র অন্ধরাজ ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। বলিলেন "যাহাতে পাণ্ডবগণের হিত হয়, আর আমার অহিত হয়, তাহাই তুমি সর্ব্বদা বল। অসতী স্ত্রী যেমন বহু মান প্রাপ্ত হইলেও স্বামীর বশীভূত হয় না, তুমিও তেমনি আমার বশীভূত হইলে না। তুমি আমাকে পরিত্যাগ কর, অথবা থাক, অথবা যেখানে ইচ্ছা গমন কর। আমি আর তোমার মুখ দেখিতে চাহি না।" এই বলিয়া অন্তঃপুরে প্রস্থান করিলেন।†

---

* বনপর্ব্ব ৪—৯।

† বনপর্ব্ব ৪ অধ্যায়।

বিদুর ভাবিলেন, আর এখানে থাকার আবশ্যক? দিন রাত যাঁহাদের হিতচিন্তা করি, তাঁহারাই আমাকে শত্রু ভাবে। হায়! কুরুকুল রক্ষা করা আমার সাধ্যাতীত। তিনি অনেক ভাবিয়া শেষে হস্তিনাপুর পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। কোথায় যাইবেন? প্রথমে কাম্যকবনে গমন করিলেন। যুধিষ্ঠির মহা সমাদরে পিতৃব্যকে গ্রহণ করিলেন। বিদুর বলিলেন "আমি তোমাকে কিছু উপদেশ দিতে আসিয়াছি। শত্রুরা অশেষ দুঃখ দিলেও যিনি তাহা সহ্য করিয়া সুসময়ের অপেক্ষা করিতে পারেন, আর তাবৎকাল উপায় সংগ্রহ করেন, তিনিই স্বরাজ্য উদ্ধার করিতে পারেন। সহায় পাইলেই উপায় হয়, সহায় পাইলেই পৃথিবী অধিকার করা যায়। সহায়গণের সহিত সতত সত্য ব্যবহার করিবে, তাহাদের মঙ্গলকে নিজ মঙ্গল মনে করিবে। তাহাদের সহিত একত্র অন্ন ভোজন করিবে, একতায় সকল উপভোগ করিবে। তাঁহাদিগের নিকট কদাচ আত্মশ্লাঘা করিবে না। তাহা হইলেই তাহারা তোমার দুঃখের ভার বহন করিবে। মনে রাখিবে, ত্যাগী না হইলে, ক্ষতি স্বীকার না করিলে, একতায় আবদ্ধ হওয়া যায় না, সহায়ও প্রাপ্ত হওয়া যায় না। একতা না থাকিলে সহায় না পাইলে প্রবলের গ্রাস হইতে স্বরাজ্য উদ্ধার করা যায় না।"

রাজা যুধিষ্ঠির বিনীতভাবে বলিলেন, "আপনার উপদেশ শিরোধার্য।"

এদিকে ধৃতরাষ্ট্র জানিতে পারিয়াছেন, বিদুর পাণ্ডবগণের নিকট গিয়াছেন। তাহাতে ভাবিলেন, বুদ্ধি যার বল তার, এখন আবার স্বয়ং বুদ্ধি সাক্ষাৎ বলের সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। এখন উপায়? *সমস্ত রজনী জাগিয়া কাটাইলেন, আর উপায় স্থির করিলেন।

প্রভাত হইয়াছে। কৌরবেরা সভায় গিয়া বসিয়াছেন। এমন সময় অন্ধরাজ সভাগৃহে প্রবেশ করিয়া "হা বিদুর! হা বিদুর!" বলিতে বলিতে সভাতলে নিপতিত হইলেন। পরে ধীরে ধীরে উঠিয়া সিংহাসনে গিয়া বসিলেন, আর অতি বিষাদে বলিতে লাগিলেন, "সঞ্জয়, সঞ্জয়, আমার ভ্রাতা আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে। তাহার ন্যায় ধর্ম্মজ্ঞ, তাহার ন্যায় প্রাজ্ঞ, তাহার ন্যায় সুহৃদ্‌, তাহার ন্যায় ভাই, আর কোথায় পাইব? তাহার শোকে আমার হৃদয় দগ্ধ হইতেছে। সে কখনও আমার অপ্রিয় আচরণ করে নাই, আমিই তাহার প্রতি অন্যায় ব্যবহার করিয়াছি। তুমি শীঘ্র যাও, শীঘ্র তাহাকে লইয়া আইস। নতুবা আমি শোকে প্রাণত্যাগ করিব।"

সঞ্জয় অবিলম্বে, রথারোহণে, অতি দ্রুতবেগে কাম্যকবনে উপনীত হইলেন। বিদুরকে বলিলেন, "তোমার দাদা তোমার শোকে প্রাণত্যাগ করিতে বসিয়াছেন। তোমাকে লইয়া যাইবার জন্য আমাকে পাঠাইয়াছেন।"

মহাত্মা বিদুর তখনই যাইতে উদ্যত হইলেন। পাণ্ডবগণের নিকট বিদায় লইয়া হস্তিনায় উপস্থিত হইলেন। রাজা ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া তাঁহার মস্তক আঘ্রাণ করিলেন।§ বলিলেন, "আমার পরম সৌভাগ্য যে তুমি আসিয়াছ। আমি ক্রুদ্ধ হইয়া কটূক্তি করিয়াছিলাম, তজ্জন্য আমাকে ক্ষমা কর।" বিদুর উত্তর করিলেন "রাজন্‌,

---

* বনপর্ব্ব ৬ অধ্যায়।
§ বনপর্ব্ব ৬ অধ্যায়।

আপনি আমার পরমগুরু ও প্রতিপালক। আমি যখন পুনরায় আসিয়াছি, তখনই পূর্ব্বকথা বিস্মৃত হইয়াছি। আর তাহার উল্লেখের প্রয়োজন নাই। আমার নিকট আপনার পুত্রগণ যেরূপ, পঞ্চ পাণ্ডবও সেইরূপ। তবে পাণ্ডবেরা দুঃখ দুর্দ্দশায় নিপতিত, এই জন্যই আমার মন তাহাদের পক্ষপাতী।"

বিদুরের আগমনে দুর্য্যোধন চিন্তিত হইলেন। শকুনি বলিলেন "তোমার কোন চিন্তা নাই। পাণ্ডবেরা সত্যপরায়ণ। ত্রয়োদশবর্ষ অতীত না হইলে তাহারা কিছুতেই আসিবে না। এমন কি, তোমার পিতা তাহাদিগের রাজ্য তাহাদিগকে ফিরাইয়া দিলেও তাহারা লইবে না।" *

তখন দুর্য্যোধনেরা সকলে মিলিয়া পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে পাণ্ডবেরা এখন মিত্রহীন, সহায় বিহীন, এই সময় তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া অনায়াসে নিহত করিবেন। তদনুসারে দুর্য্যোধন, কর্ণ, শকুনি, দুঃশাসন প্রভৃতি সকলে বহু রথে আরোহণ করিয়া পাণ্ডব বিনাশার্থ নির্গত হইলেন।। এমন সময় বেদব্যাস আসিলেন। তিনি সকলকে নিবারিত করিয়া কৌরব সভায় প্রবেশ করিলেন। বৃদ্ধরাজকে বলিলেন "কেন দুর্য্যোধন পাণ্ডবদিগকে সতত বিনষ্ট করিতে চায়? সে অতিশয় মন্দবুদ্ধি ও পাপাত্মা। তাহাকে তুমি নিবারণ কর। নতুবা পাণ্ডবগণকে বনে বিনষ্ট করিতে চাহিলে সে বিনষ্ট হইবে। বিশেষ আত্মদ্রোহ অতি গর্হিত, অধর্ম্মকর ও অযশস্কর।" ‡

অন্ধরাজ বলিলেন, "মহাত্মন্ আমি সকলই বুঝিতেছি। দুর্য্যোধন যে পাপাত্মা তাহাও জানি। কিন্তু কি করিব, পুত্রস্নেহবশতঃই আমি তাহাকে ত্যাগ করিতে পারিতেছি না। পুত্রস্নেহবশতঃই আমি তাহার অধীন হইয়া পড়িয়াছি। আমি অনুপায়।" ব্যাসদেব ক্ষুণ্ণমনে প্রস্থান করিলেন। দুর্য্যোধন ভাবিতে লাগিলেন, তাঁহার পিতা ও পিতামহ ব্যাসদেব উভয়ই তাঁহার শত্রু।

এমন সময় মৈত্রেয় ঋষি আসিলেন। তিনি রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন, "তুমি পাণ্ডবগণের সহিত যেরূপ ব্যবহার করিয়াছ, তাহা দস্যুর আচরণ তুল্য।" পরে দুর্য্যোধনকে বলিলেন "তুমি পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি-সৌহার্দ্দ্যে আবদ্ধ হও তাহাতেই তোমার মঙ্গল হইবে, কুরুকুলের মঙ্গল হইবে। কৃষ্ণ যাহাদের সহায়, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডী যাহাদের আত্মীয়, তাহাদের সহিত কে যুদ্ধ করিতে পারে?" § ঋষিও অকৃতকার্য্য হইয়া প্রস্থান করিলেন। যে দুর্য্যোধনকে সৎ পরামর্শ দিতে লাগিল, তাহাকেই তিনি শত্রু বলিয়া স্থির করিতে লাগিলেন। আর যে কুপরামর্শ দিতে লাগিল, তাহাকেই তিনি পরম মিত্র বলিয়া আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। হায়, এইরূপ বিপরীত বুদ্ধির জন্যইত সুখের সংসার ছারখার হয়; বিশাল সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়! প্রবল জাতি অধঃপাতে যায়। মোহই এই বিপরীত বুদ্ধির মূল।

---

* বনপর্ব্ব ৭—৮।

† বনপর্ব্ব ৭—২২।

‡ বনপর্ব্ব ৮ অধ্যায়।

§ বনপর্ব্ব ১০—২৬।২৭।

পাণ্ডবগণ বনবাসে গিয়াছেন শুনিয়া তাহাদিগকে দেখিবার জন্য কৃষ্ণ, সাত্যকি, ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি আত্মীয় স্বজন কাম্যক বনে আসিয়াছেন। কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, "পাশাখেলা অতি অন্যায় কার্য্য। পাশাখেলা, রতি, মদ্যপান, দিবা নিদ্রা ও মৃগয়া পঞ্চ ব্যসন বা পতনের কারণ বলিয়া সতত নিন্দিত। সে সকলই পরিত্যজ্য। তবে যাহা হইবার তাহা হইয়াছে। এখন আমরাই যুদ্ধ করিয়া পাপাত্মা দুর্য্যোধন ও তাহার সহকারী দিগকে নিহত করিব, আর আপনার সিংহাসন আপনাকে দিব।' *

ধর্ম্মরাজ উত্তর করিলেন, "ত্রয়োদশ বর্ষ পরে তোমরা সাহায্য করিও, এখন নহে। তাহার পূর্ব্বে আমি কোন মতেই রাজ্য গ্রহণ করিতে পারিব না। আমি যখন সত্য করিয়াছি যে দ্বাদশ বৎসর বনবাস করিব ও আর এক বৎসর অজ্ঞাত বাস করিব, তখন সেই সত্য অবশ্য পালন করিব। । সত্য গেলে ধর্ম্মও যায়। বিশেষ যাহার কথার মূল্য নাই, তাহার নিজের মূল্য কি ?'

## তৃতীয় অধ্যায়।

## দ্রৌপদীর উদ্দীপনা।

একবনে অধিক দিন বাসকরা সুখকর নহে। বিশেষ তাহাতে সে বনের মৃগকুল একেবারে ধ্বংস হয়। এজন্য পাণ্ডবেরা দ্রৌপদীকে লইয়া মনোহর দ্বৈতবনে আসিয়াছেন। তাহার মধ্যস্থলে বৃহৎ সরোবর। তাহার তীরে তপস্বী ও তপস্বিনী গণের আশ্রম।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। পঞ্চপাণ্ডব ও বিদুষী দ্রৌপদী তাহাদের পর্ণ কুটীরে বসিয়া কথোপকথন করিতেছেন। পূর্ব্বে ভারতে বিদুষীর অভাব ছিল না।* কিছুকাল পরে দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, "রাজন্, তোমাকে একদিন রাজসভায় রত্নখচিত গজদন্তের সিংহাসনে দর্শন করিয়াছি, আর আজ এই বনে কুশাসনে দেখিতেছি। তোমার শরীর সতত চন্দন চর্চ্চিত থাকিত, আর আজ ধূলিধূসরিত দেখিতেছি। তোমার অনুজগণ কত সুখ ভোগ করিত, আর আজ এত দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছে। তাহাতে আমার পাষাণ হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে, তোমার কোমল হৃদয় কি দুঃখিত হইতেছেনা? একটুকুও ক্রোধের উদয় হইতেছে না? একদা মহাবল বলি তাঁহার পিতামহ প্রহ্লাদকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "ক্ষমা ও ক্রোধ প্রদর্শনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কি? প্রহ্লাদ উত্তর করিয়াছিলেন, 'সর্ব্বদা ক্ষমা করাও ভাল নহে, সর্ব্বদা ক্রোধ প্রদর্শনও উচিত নহে। যিনি সর্ব্বদা ক্ষমা করেন, তাঁহার স্ত্রী, পুত্র, ভৃত্য, শত্রু ও মিত্র, সকলেই তাঁহাকে অবজ্ঞা করে। দুষ্টেরা প্রশ্রয় পায়, শত্রুর সংখ্যা বৃদ্ধি হয়। আবার যিনি সতত ক্রোধ প্রদর্শন করেন তিনি সতত ক্রোধের অধীন থাকেন, সতত কটুবাক্য বলেন, সকলের অবমাননা করেন। সকলেই তাঁহাকে ভৎর্সনা করে, অপমান করে। তিনি উপকারককে অসন্তুষ্ট করেন, মিত্রকে শত্রু করিয়া তুলেন, সকলেই তাঁহার অনিষ্টাচরণ করে। অতএব মনুষ্য সর্ব্বদা ক্রোধ করিবে না, সর্ব্বদা ক্ষমাও করিবে না। কখন্ ক্ষমা ও কখন্ তেজ প্রদর্শন করিতে হইবে, তাহাও

* বনপর্ব্ব ১২—৬।৭　　। বনপর্ব্ব ১২০ অধ্যায়।

* পূর্ব্বে এ সম্বন্ধে এই গ্রন্থে শান্তিপর্ব্বের ৫ম অধ্যায়ে 'স্ত্রীশিক্ষা' দ্রষ্টব্য।

বলিতেছি। দেশ কাল পাত্র বিবেচনা না করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে, ফল হয় না। সে সকল পূর্ব্বেই বিবেচনা করিয়া, নিজের বলাবল বুঝিয়া ক্ষমা বা তেজ প্রকাশ করিবে। স্থল বিশেষে অপরাধীকেও লোকভয়ে ক্ষমা করিবে। পূর্ব্ব উপকারক পরে অনিষ্ট করিলে ক্ষমার পাত্র। সকলেরই প্রথম অপরাধ ক্ষমার যোগ্য। অজ্ঞান কৃত অপরাধ সতত ক্ষমা করিবে। এই সকলের বিপরীত স্থলে তেজ প্রকাশ করিবে। মুখে মধু কিন্তু হৃদয় কুটিল, এইরূপ মৃদু ব্যক্তিকে কদাচ ক্ষমা করিবে না। রাজন্, এই সকল সার কথা কি তুমি ভুলিয়া গিয়াছ? দুর্য্যোধনেরা সতত তোমাদের অনিষ্ট করিতেছে, সতত দুঃখ দিতেছে, সতত কত জ্ঞানকৃত অপরাধ করিতেছে, তথাপি তোমার ক্রোধের উদয় হইতেছে না।"

যুধিষ্ঠির উত্তর করিলেন, "দেবি, ক্রোধই মানুষের সর্ব্বপ্রধান শত্রু। ক্রোধই মানুষের সর্ব্বনাশ করে। লোকে ক্রুদ্ধ হইলে তাহার হিতাহিত জ্ঞান লুপ্ত হয়। কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্যের বিচার বুদ্ধি বিনষ্ট হয়, কার্য্যদক্ষতার শেষ হয়। ক্রোধী ব্যক্তি করিতে না পারে, এমন কোন কুকার্য্য নাই। বলিতে না পারে এমন কোন কুকথা নাই। সে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির অপমান করে, গুরুজনকে নিহত করে। রাজা ক্রুদ্ধ হইলে তাহার অত্যাচারের সীমা থাকে না। শেষে সেই উৎপীড়ন বশতঃই প্রজাগণ একতায় আবদ্ধ হয়, একতাবদ্ধ হইয়া উত্থান করিয়া রাজার সর্ব্বনাশ করে। জ্ঞানী ব্যক্তি সর্ব্বদা ক্ষমাশীল। যিনি বলবান ও ক্ষমতাশালী হইয়াও অপকারকের প্রতি কখনও ক্রোধ প্রকাশ করেন না, তিনিই বিজ্ঞ, আবার যিনি দুর্ব্বল ও ক্ষমতাহীন, তিনি নিজ মঙ্গলের জন্য ক্রোধকে অবশ্য দমন করিবেন। তেজস্বী পুরুষ কখনও ক্রোধের বশীভূত হন না। কেহ অনিষ্ট করিয়াছে বলিয়া যদি তাহার অনিষ্ট করিতে হয়, তাহা হইলে প্রথম অনিষ্টকারী ব্যক্তি আবার নূতন অনিষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হয়। সে স্থলে তাহার প্রতি আবার নূতন প্রতিহিংসার প্রয়োজন হয়। এইরূপ হইলে হিংসা ও প্রতিহিংসা অবিরাম চলিতে থাকে। পৃথিবী বাসের অযোগ্য হইয়া উঠে, জগতে ক্ষমা আছে বলিয়াই এত সৌহার্দ্য, এত সখ্যতা। মহামুনি কাশ্যপের সুন্দর গাথা কি ভুলিয়া গিয়াছ? 'যিনি ক্ষমাকে ধর্ম্ম, ক্ষমাকে যজ্ঞ, ক্ষমাকে বেদ বলিয়া জ্ঞান করেন, তিনিই সকল সময়ে ক্ষমা করিতে সমর্থ। ক্ষমাই সত্য, ক্ষমাই তপস্যা, ক্ষমাই মঙ্গল, ক্ষমাই ব্রহ্ম, ক্ষমার জন্যই সংসার চলিতেছে।' ঋষিরা যে অনুপম গাথা গাহিয়া চিত্তসংযমে অভ্যস্ত হন, আমি সেই গাথা গান করিয়া কিরূপে ক্রোধকে প্রশ্রয় দিতে পারি? মিথ্যা অপেক্ষা সত্য, হিংসা অপেক্ষা অহিংসা, ক্রোধী অপেক্ষা অক্রোধী, অসহিষ্ণু অপেক্ষা সহিষ্ণু, মূর্খ অপেক্ষা পণ্ডিত চিরদিনই শ্রেষ্ঠ। অহিংসা পরম ধর্ম্ম, ক্ষমা পরম বল।"

বিদুষী উত্তর করিলেন, "রাজন্, বিজ্ঞলোকে পুরুষকার দ্বারা স্বদেশের উদ্ধার সাধন করে। উদ্‌যোগ দ্বারা সকলেই অভীষ্ট প্রাপ্ত হয়, বিপুল বিত্ত উপার্জ্জন করিতে সমর্থ হয়। দৈবের কোন ক্ষমতা নাই। কর্ম্ম না করিলে দৈব কিছুই দিতে পারে না। যদি বলা যায় যে মনুষ্যের কর্ম্ম করিবার স্বাধীনতা নাই, সে ঈশ্বর কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া নিরুপায় হইয়া সকল করে, তাহা হইলে ঈশ্বরই কার্য্যের ফলাফলের জন্য দায়ী হন, পাপ পুণ্যের ভাগী হন। মনুষ্য দায়িত্ববিহীন হইয়া পড়ে। যদি তাহা সত্য না হয়, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয়,

মনুষ্য স্বাধীনভাবে কার্য্য করে ও কার্য্যের অনুরূপ ফলভোগ করে। তুমি কোন কার্য্য করিবে না, অলসভাবে বসিয়া থাকিবে, কিরূপে প্রবলের গ্রাস হইতে স্বদেশ উদ্ধার করিবে? চেষ্টা ও সাধনা দ্বারা যে অসাধ্য সাধিত হয়, তাহা তুমি একেবারে ভুলিয়া গিয়াছ। হায়, মনুষ্য কখনও নিজশক্তিতে বিশ্বাসবিহীন হইবে না। তবে যে চেষ্টা সত্বেও সকল কার্য্যই সফল হয় না, তাহার কারণ আছে। বহু কারণের সমবায় হইলে তবে কর্ম্ম ফলপ্রদ হয়। ধীরভাবে, বুদ্ধি ও বল অনুসারে, দেশ কাল পাত্রের বিচার করিয়া, সামদান ভেদ দণ্ড নীতি অনুসারে পুরুষকার প্রয়োগ করিলে কেন না কার্য্য ফলবান হইবে? কেন না স্বদেশের উদ্ধার হইবে?

ভীমও অনেক বুঝাইলেন, তথাপি যুধিষ্ঠির বিচলিত হইলেন না। তিনি বলিলেন, "প্রতিপক্ষ প্রবল, আমরা দুর্ব্বল। কোন্ সময় প্রবলের সহিত দুর্ব্বলের বিবাদ করা উচিত? যখন প্রবল বিপদাপন্ন বা আত্মদ্রোহ নিমগ্ন হয়। অথবা যখন দুর্ব্বল সহায় পায়, ধনবল ও জ্ঞানবলে বলীয়ান হয়। এখন এরূপ অবস্থা আসে নাই। সুতরাং এখনও আমাদের পুরুষকার প্রদর্শনের সময় উপস্থিত হয় নাই। দেখিতেছ না পিতামহ, আচার্য্য, কর্ণ প্রভৃতি প্রবল যোদ্ধাগণ সকলেই দুর্য্যোধনের পক্ষে? বিশেষ আমি কোন কারণেই সত্য ভঙ্গ করিতে পারিব না। কাজেই আমাদিগকে ত্রয়োদশ বর্ষ অপেক্ষা করিতে হইবে। রাজ্য, পুত্র, যশ ও ঐশ্বর্য্য, এ সমস্তও সত্যের ষোড়শ অংশের একাংশেরও সমান নহে।"

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র লাহিড়ী।

---

# ফুলের প্রতি মূল।

যবে তুমি বিকাশিবে পূর্ণ আঢ্য যৌবনের সুখে
ভর দিয়া বৃন্তের উপরে,
মনে রেখো, ছিলে তুমি সুপ্ত লুপ্ত আমারি এবুকে
মৃত্তিকার সূতিকার ঘরে।

ফাটিল সে স্তব্ধ বুক, ফাটিল সে মৌন মূঢ় মাটি,
হল নব অঙ্কুর উদ্গম,
যোগাতে তাহারি রস আমাদের দিন গেল কাটি
আমাদের সার্থক জনম॥

দিনে দিনে বাড়িল সে, কচি তার ডাল পালা মেলি
খুলি দিয়া পাতার বাহার,
আকাশের আলো খেয়ে, বাতাসের সাথে দোল খেলি
কাটি গেল কৈশোর তাহার।

শেষে বিধাতার বরে, একদিন প্রসন্ন প্রভাতে,
পত্র পুটে দেখা দিলে তুমি,
কৃতার্থ হলাম দোঁহে সেই তব আসন্ন শোভাতে
—জননী তোমার, জন্মভূমি॥

সমীরণ সখা এবে, দেবতার তুমি সহচরী,
মধুলোভে ফিরে মত্ত অলি
নারীর স্বজাতি তুমি, স্থান তব তার শিরোপরি,
স্তুতি গান গাহিছে সকলি॥

তবু মনে রেখো তুমি, একদিন ম্লান সন্ধ্যাবেলা
দু'দিনের লীলা সাঙ্গ হ'লে,
ঝরিয়া পড়িবে পুনঃ, ছিন্নবৃন্ত, মলিন, একেলা,
দীন ধাত্রী ধরিত্রীর কোলে॥

শ্রীইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী।

---

## নারীর কথা।*

আজকাল অনেকেই দেখ্‌ছি—মাসিকপত্রে প্রবন্ধ লিখে, সভায় বক্তৃতা করে, ম্যাজিক আলোর ছবি দেখিয়ে, শিশু প্রদর্শনী ক'রে মাদের মেয়েদের অজ্ঞান চক্ষে জ্ঞানাঞ্জন শলাকা প্রয়োগ করবার চেষ্টা করে দেশের আর দশের হিত সাধনের জন্য স্থির সংকল্প হয়েছেন—বাস্তবিক এটা যে বড় আহ্লাদের বিষয় তা' আমরা সকলেই স্বীকার করে নিয়েছি আর নিচ্ছি। আবার ঐ উদ্দেশ্যেই যেন দু'একখানা প্রসিদ্ধ 'মাসিকে' আলাদা করে নাম দিয়ে মেয়েদের বিভাগ নির্দ্দেশ করে দেওয়া হয়েছে, পাছে, সেটা কোন 'অ-নারী' পড়ে ফেলেন।

---

* লেখিকা যে প্রশ্নটী তুলিয়াছেন তাহা ভাবিবার বিষয়। সংসার ও সন্তান প্রতিপালন সম্বন্ধে আমাদের যে উদাসীনতা আছে তাহা নিবারণ করিতে হইলে কি পুরুষ কি স্ত্রী লোক সকলেরই দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন হওয়া উচিত। অর্দ্ধ শিক্ষা যে অনেক সময় ক্ষতির কারণ হইয়া দাঁড়ায় তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আমাদের মনে হয় যে লেখিকা একটী বিষয়ে ভুল করিয়াছেন। মহিলা মজলিস ও মাতৃমঙ্গলের প্রবর্ত্তকেরা পুরুষের দায়িত্ব কোথাও অস্বীকার করেন না। আমাদের দেশে পুরুষদিগের জানিবার অনেক ব্যবস্থা আছে কিন্তু অন্তঃপুরিকা নারীদিগের সেইরূপ শিক্ষার কোন প্রকার সুব্যবস্থা না থাকায় মাসিক পত্রিকাগুলি তাঁহাদের শিক্ষার একরূপ উপায় বলা যাইতে পারে। তাই অন্ততঃ ইহাতে তাঁহারা যতটা জ্ঞান লাভ করিতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে ইহা করিয়া তাঁহারা সহৃদয়তারই পরিচয় দিয়াছেন। আর ইহাও বোধ হয় কেহ অস্বীকার করিবেন না যে সাধারণ নারীদিগের শিক্ষা পুরুষদিগের অপেক্ষা কম এই জন্য তাঁহাদের শিক্ষার অতিরিক্ত কোন ব্যবস্থা করিলে অসঙ্গত হয় না। নঃ সঃ।

আমার মনে এই সম্বন্ধে একটা প্রশ্ন জাগ্‌ছে, হয় ত সেটা নির্ভয়ে কর্‌লে কোন অপরাধ হবে না। এই যে 'মাতৃমঙ্গল' 'মহিলা মজলিস্‌' প্রভৃতি বিভাগীয় নামকরণ করা হয়েছে তার সঙ্গে 'পুরুষ-পারিষদ' 'জনক-কল্যাণ' নামে কোন বিভাগ কেন করা হয়নি? তাঁদের কি ও সব বিষয় শেখবার কিছু নেই? যত শিক্ষণীয় বিষয় আছে সবই কি মা'দের আর স্ত্রীদের ভাগে পড়ে? না জানার জন্য যত দোষ ঘটে তার জন্য লজ্জিত তাঁদেরই হতে হবে? আর ভবিষ্যতে যাতে সে সব না ঘটে সেটার জন্য অবহিত হতে হবে? এখনো কি সেই যুগ আছে যে যুগের সব বিষয়ের মূল কারণ নারী ছিল?

পুরুষের ভগবৎ সাধনার অক্ষমতার কারণ কি? 'নারী', পুরুষ কেন অলস? 'নারীর জন্য' পুরুষ কেন চঞ্চল? 'রমণীর জন্য', পুরুষ কেন স্বাস্থ্যহীন? 'স্বাজাতির জন্য', দেশে কেন শিশু মৃত্যু? জননীদের জন্য', দেশে কেন অকাল মৃত্যু 'পত্নীদের জন্য', দেশ কেন বিলাসী 'রমণীর জন্য', দেশ কেন দুর্ব্বল? 'মেয়েদের জন্য', শেষটা দেশে কেন অসার সাহিত্য বাড়ছে, তাও সেই আমাদেরই জন্য!

ছোটবেলায় ঠাকুমার কাছে গল্প শুনে শেষ হয়ে গেলে, "আমার কথাটি ফুরোলো নটে গাছটি মুড়োলো, কেনরে নটে মুড়ালি? রাখাল কেন জল দেয় না" ইত্যাদি করে শেষে আছে "কেনরে ছেলে কাঁদিস্‌? পিঁপড়ে কেন কামড়ায়? কেনরে পিঁপড়ে কামড়াস? কুটুস্‌ কুটুস্‌ কামড়াবো, গর্ত্তের মধ্যে ঢুকবো" এই যে ছড়াটি শুনতাম এর যেমন সব ঘটনার মূল কারণ ঐ পিঁপড়ে, এ দেশেও তেমান সব ঘটনার মূল কারণ সকলেই প্রকারান্তরে আমাদের স্ত্রীজাতিকেই নির্দ্দেশ করেন। এখন তাঁদেরও যদি ঐ পিঁপড়ের মতন "বেশ করবো" ভাব হয় তা হলে হয় ভালো, কিন্তু তাঁদের এখনো অত ভরসা হয় নি। কাজেই সেটা কারুর মুখে শোনা যায় না। তবু মাঝে মাঝে দুঃসাহসিকতা করে জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে করে দেশের অশিক্ষা, অসংযম, বিলাস, অকাল মৃত্যু ইত্যাদি সব বিষয়ের মূল কারণ কি বাস্তবিকই আমরা? আর যদিই আমরা হই (অবশ্য আমরা সেটা মানতে প্রস্তুত হই) তা হলে কাদের দোষে সেটা ঘটেছে?

আমাদের বল্‌তে লজ্জা করে আর দুঃখও হয় যে পুরুষেরা এমন অদূর-দৃষ্টি সম্পন্ন, যে তাঁরা সব জিনিষের মূল কারণটা দেখতে পান না, (কিম্বা দেখতে চান না) অথচ প্রতিকার করতে চান! কিম্বা মূল বিষয়ের প্রতিকার করতে গেলে পাছে স্বার্থসিদ্ধিতে বিঘ্ন ঘটে, বোধ হয় সেই ভয়ে তাকে এড়িয়ে চলেন। আমাদের বিশ্বাস, আসলে সকলেই জানেন প্রতিকারের জন্য কি করা উচিত, অথচ যে ঠিক নিয়মানুযায়ী করতে চান না, তার মানে তাঁরা তাঁদের অবাধ অত্যাচার বা যথেচ্ছাচারের পথ বন্ধ করতে চা'ন না।

এই সব জিনিষের প্রতিকার করতে গেলে মেয়েদের ভালো করে শিক্ষা পাওয়া দরকার; আর তাই করতে গেলেই বেশী বয়সে বিবাহ হবে, সে বয়সে বিবাহ হলে তাঁরা সন্তানের জননী হলে সন্তানও ঠিক প্রতিপালন করতে পারবেন; আর লজ্জার কথা, পুরুষের কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করে দিতে পারবেন! কেন না মা'রা জ্ঞানে, অজ্ঞানে 'যেন তেন প্রকারেন' যার

কর্ত্তব্য করে থাকেন, কিন্তু পিতারা কতখানি পিতার কর্ত্তব্য পালন করেন? অবশ্য কেউ মনে করবেন না আমি সকলকে বলছি।

যখন অপরিণত বুদ্ধি ও দেহ নিয়ে একটা ১৩।১৪ বছরের মেয়ে প্রথম 'মা' হয়, আর পর পর বহু সন্তানের জননী হয়, তার স্বাস্থ্য, তার সন্তানগুলির স্বাস্থ্য কি রকম ভাবে আছে, গড়ে উঠছে, ছেলেমেয়েগুলির বুদ্ধি, চরিত্র, শিক্ষা যা কিছু সবই কি মা'র কর্ত্তব্যের ভাগে পড়ে? সবই কি মহিলা মজলিস্ মাতৃমঙ্গল দ্বারা প্রতিকৃত হবে? এর জন্যে কোথাও পিতার কর্ত্তব্য নেই? আমরা বস্তুত জগতে যা' দেখতে পাই (মাসিকপত্রের পাতায় বা সভায় নয়) তা'তে ধনীরা স্বাস্থ্যহীনা প্রসূতিদের ডাক্তার দেখিয়ে, আর শিশুগুলিকে দাসদাসীর হাতে সমর্পণ করে ও স্কুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে কর্ত্তব্যের শেষ করেন, মধ্যবিত্তেরা ঐ একটু কমজমে করেন, দরিদ্রের কথা ত কারুর অবিদিত নেই। অথচ এঁরা যে শিক্ষিত ন'ন, তা' নয়। অনেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপাধিধারী, বিদ্বান ত বলতেই হবে। এই সব অপকার থেকে উদ্ধার পাবার মত বিদ্যা বুদ্ধি প্রায় এঁদের সকলেরই আছে, অন্ততঃ থাকা ত উচিত, অনেকে চিকিৎসকও! কিন্তু এঁরা এই সমস্ত দোষই আমদের প্রতি আরোপ করেন, আর প্রতিকারের জন্যে ওজন করে, মেপে, হিসাব করে, আমাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে চান!

সব বিষয়েরই ক্ষতি বা অনিষ্ট হওয়ার মূল কারণ, সে বিষয়ে অজ্ঞতা। যে অজ্ঞ হবে সে ভুল করবেই, ফলে অনিষ্ট হবেই। এর প্রতিকার হচ্ছে সেই বিষয়টী ভালো করে জানা; এ' নয় যে, প্রতিকারের নিয়ম অভ্যাস করা। কিন্তু এদেশের অভিভাবক বা আমাদের ভাগ্যনিয়ন্তাদের এমন লেখাপড়া আতঙ্ক আছে, যাকে আমরা, কুসংস্কারাচ্ছন্ন মেয়েরা ও কুসংস্কার বলতে পারি। তাঁরা এমনি অবিশ্বাসী ও দুর্ব্বলচিত্ত যে পাছে বাইরের খবর মেয়েদের কানে প্রবেশ করে, পাছে তারা দেখতে পায় যে অন্য দেশের মেয়েরা শুধু কর্ত্তব্য দিয়ে গঠিত দেহবিশিষ্ট জীব মাত্র নয়, কতকগুলো মানুষোচিত বৃত্তিও তাদের আছে, যা'তে তারা কর্ত্তব্য করছে স্বাভাবিক ভাবে, অভ্যাসগত ভাবে নয়; তাই শিশুপ্রদর্শনী, ম্যাজিক আলো বক্তৃতা ও মাতৃমঙ্গল মহিলা-মজলিস্ প্রভৃতি দেখিয়ে শুনিয়ে পড়িয়ে পুরো শিক্ষা না দিয়ে আংশিকভাবে শিক্ষা দিতে চা'ন।

এটা যে কালে আমাদের অসংখ্য কুসংস্কারের আর গোটাকতক সংখ্যা না বাড়াবে তারই বা কি ঠিক? কোন জিনিষ গোড়া থেকে না শিখিয়ে শুধু অভ্যাস করলে যে কি দোষ হয় তা কি এখনও কারুর হৃদয়ঙ্গম হয় নি? আমাদের 'হাঁচি, টিকটিকি, শুচিতা যাত্রা, অযাত্রা, আঁতুড় ঘর, নজর লাগা, মাদুলী, তাগা, ভাদ্র, চৈত্র, পৌষ এমন কি সমুদ্র যাত্রা সব জিনিষের মূলেই কি অভ্যাস নেই?

এই শিশু প্রদর্শনী দেখে বা ছবি দেখে সাধারণ মেয়েরা কি মন্তব্য বা অভিমত দেয় তাকি পুরুষেরা জানেন? সেবার দিল্লীতে শিশু প্রদর্শনীর পর জন কয়েক হিন্দুস্থানী ভদ্র মহিলা বলেছিলেন যে ঐ রকম লোমের জামা আর এনামেলের বাটী, খাট, বিছানা, কম্বল, তোয়ালে, ফিডিং বটল পেলে তাঁরাও ছেলেকে মানুষ করতে ভাল করেই পারেন, পরিষ্কার

রাখাও পারেন, তাঁদের ত মেয়েদের মতন ও সব নেই তাঁরা আর মিছামিছি তবে ওসব দেখে কি করবেন! তাঁরা এটা কেউ বুঝতেই পারেন নি, স্বাস্থ্যের জন্যই পরিচ্ছন্নতা দরকার, আর তা কাঁসার বাটী ও ছেঁড়া নেকড়াতেও রাখা যায়। আর মজা হচ্ছে এই পুরুষে রোগ কোথায় জেনেও প্রতিকার করতে সাহস করেন না, আমাদের চোখ ফোটার ভয়ে কিন্তু এত আড়াল করেও কি তাঁরা সফল হয়েছেন?

শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী দেবী।

# পোষ্ট গ্রাজুয়েট শিক্ষা-পদ্ধতি।

## তৃতীয় প্রস্তাব।

আমরা বিগত কয়েকটি প্রস্তাবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট গ্রাজুয়েট শিক্ষাপদ্ধতির যে বিবরণ প্রদান করিয়াছি, তাহা হইতে পাঠক দেখিতে পাইয়াছেন যে, বাঙ্গলা দেশের মত একটা প্রকাণ্ড দেশের ছাত্রবর্গের শিক্ষণীয় প্রায় তাবৎ প্রয়োজনীয় বিষয়েরই ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে। এইগুলির মধ্যে কোনটিই পরিত্যাগ করা যায় না। পরিত্যাগ করিলেই শিক্ষা অসম্পূর্ণ হইয়া উঠিবে। আমরা, যে যে বিষয় নির্ব্বাচিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে প্রায় তাবৎ বিষয়েরই, সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া দেখাইয়াছি। একটা এত বড় দেশের বিশ্ববিদ্যালয়কে Teaching University রূপে পরিণত করিতে হইলেই, শিক্ষণীয় বিষয়ের বাহুল্য অনিবার্য্য হইয়া পড়িবেই। কিন্তু এই বিষয় বাহুল্য দর্শনে অনেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপরে দোষারোপ করিতে ত্রুটি করিতেছেন না। তাঁহারা বলিতেছেন যে, এত বিষয় বাহুল্য করিতে গেলেই, ব্যয় বাহুল্য ও সঙ্গে সঙ্গে অনিবার্য্য হইয়া উঠে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় এত অর্থ পাইবে কোথা হইতে? তাঁহারা বলিতেছেন এই যে, অর্থ সংস্থানের দিকে দৃষ্টি না দিয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ, নিতান্ত অদূরদর্শীর মত, শিক্ষণীয় বিষয় গুলির বাহুল্য প্রবর্ত্তিত করিয়া, বিশ্ববিদ্যালয়টাকে 'দেউলিয়া' অবস্থায় উপনীত করিয়াছেন। এই সেদিন ও শিক্ষা সচিব স্বয়ংও বিশ্ববিদ্যালয় প্রবর্ত্তিত এই বিষয় বাহুল্যের প্রতি কটাক্ষ করিয়া, ইহাকে 'Thoughtless expansion' আখ্যায় আখ্যাত করিয়াছেন! কিন্তু এই প্রকার দোষারোপ কতদূর সঙ্গত, আমরা এস্থলে সর্ব্বপ্রথমে সেইটাই বিশ্লেষণ করিতে ইচ্ছা করিতেছি এবং পাঠকবর্গ ও বঙ্গদেশীয় অভিভাবক বর্গের দৃষ্টি আমরা দুইটা অতি প্রয়োজনীয় বিষয়ের প্রতি আকর্ষিত করিতে চাই।

প্রথম কথা এই যে, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষণীয় বিষয় গুলির বাহুল্য সম্পাদন করিয়া ব্যয়-বাহুল্য ঘটাইয়াছেন কি না? আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের রিপোর্ট হইতেই দেখিতে পাইতেছি যে, এই সকল বিষয়ের শিক্ষা দিবার ভার বিশ্ববিদ্যালয় আপন হস্তে লওয়ায়, তাহার জন্য বার্ষিক

কিঞ্চিদধিক পাঁচ লক্ষ টাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয় করিতে হইতেছে। কিন্তু, আমরা সসম্ভ্রমে বাঙ্গলাদেশের অভিভাবক বর্গকে জিজ্ঞাসা করিতে চাই যে, প্রকৃতই কি এই পাঁচ লক্ষ টাকা ব্যয় বড়ই অমার্জ্জনীয় অপরাধ করা হইতেছে? এত বড় একটা প্রকাণ্ড মহাদেশের অগণিত অধিবাসীর বিদ্যাগ্রহণেচ্ছু ছাত্রবর্গের উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা ও বিধানের জন্য, এই পাঁচ লক্ষ টাকা কি বড়ই অধিক ব্যয় বলিয়া প্রকৃতই বিবেচিত হইবার যোগ্য? এই প্রকাণ্ড মহাদেশের গভর্ণমেণ্ট কি এ দেশবাসী ছাত্রবর্গের উন্নত শিক্ষার নিমিত্ত বৎসরে পাঁচটী লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে অসমর্থ? ইউরোপের কোন সভ্য প্রদেশের কোন গভর্ণমেণ্টকেই ত তত্তদ্দেশবাসীর শিক্ষা সৌকর্য্যার্থ এতৎ পরিমিত অর্থ ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত দেখিতে পাওয়া যায় না।

তবে বাঙ্গলাদেশের সুসভ্য, শিক্ষা-গৌরব-কামী গভর্ণমেণ্টই বা এই স্বল্প পরিমিত ব্যয় করিতে কেন কাতরতা প্রকাশ করিবেন? আমরা একথাটা আদৌ বুঝিয়া উঠিতে পারি না। নব প্রতিষ্ঠিত "ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়", কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায়, সীমায় ও সংখ্যায় নিতান্তই নগণ্য।

কিন্তু তথাপি সেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে গভর্ণমেণ্ট বার্ষিক সাত লক্ষ টাকা দিয়া সাহায্য করিয়াছেন। কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সমগ্র বঙ্গদেশের ন্যায় একটা প্রকাণ্ড মহাদেশের অগণিত অধিবাসীর ছাত্রবর্গের শিক্ষা বিধান করিতে গিয়া, গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে একরূপ কিছুই সাহায্য পাইতেছে না, ইহা কি নিতান্তই বিস্ময়জনক নহে? অথচ, আমরা, পুলিশ প্রভৃতি অন্যান্য বিষয়ের জন্য বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টকে মুক্ত হস্তে যদৃচ্ছারূপে ব্যয় করিতে অকুণ্ঠিত চিত্ত দেখিতে পাইতেছি। দেশবাসীর শিক্ষা-বিধানের জন্য গভর্ণমেণ্টের স্কন্ধে যে গুরুতর দায়িত্ব অর্পিত রহিয়াছে, সেই দায়িত্ব গভর্ণমেণ্ট কি এই প্রকারেই উদ্‌যাপিত করিতে প্রকৃতই অধিকারী? আমরা সবিনয়ে গভর্ণমেণ্টকেই এই কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি। যে শিক্ষা-সচিবের মুক্ত-হস্ত হইতে, ঢাকার জন্য সাত লক্ষ টাকা ব্যয় অনায়াসে বাহির হইল, সেই শিক্ষাসচিব কোন্ প্রকার কর্ত্তব্যের বলে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে একরূপ কিছুমাত্র সাহায্য না করিয়াই, "thoughtless expansion" বলিয়া অভিযোগ করিতে উদ্যত হইলেন, ইহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। * আমরা আর একটা কথা ও বাঙ্গলাদেশের অভিভাবক বর্গকে ভাবিয়া দেখিতে অনুরোধ করি। এই মহাদেশে একরূপ অগণিত অর্থ-শালী ভাগ্যবান্ পুরুষ রহিয়াছেন। ইহাঁরা বৎসরে এরূপ কত পাঁচলক্ষ টাকা নিতান্ত তুচ্ছ বিলাস বিষয়ে অকাতরে ব্যয় করিয়া থাকেন। কিন্তু এই যে তাঁহাদেরই দেশে, তাঁহাদেরই দ্বারের নিকটে তাঁহাদেরই দেশবাসী বিদ্যা-লাভার্থী অসংখ্য ছাত্রবর্গের উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় করিয়া দিয়া, অর্থ সাহায্যের আশায় দণ্ডায়মান হইয়াছেন; কিন্তু হায়! আজ পর্য্যন্ত কয়টী অর্থশালী ধনী সন্তান, ইউরোপের ন্যায়, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, স্বয়ং উপস্থিত হইয়া—অযাচিত ভাবে—বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসারিত হস্তে অর্থ সাহায্য করিতে অগ্রসর হইয়াছেন? ইচ্ছা করিলে

* অপ্রয়োজনীয় বিষয়ের জন্য গভর্ণমেণ্ট যে ব্যয় নূতন বজেটে নির্দ্দেশিত করিয়াছেন, সে গুলিকে শিক্ষাসচিব কেন Thoughtless expansion বলিতেছেন না? এই সকল বিষয়ে ব্যয়বাহুল্য ঘটানের জন্যই ত গভর্ণমেণ্ট দেউলিয়া হইয়াছেন এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিষয়ে ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন!!!

এবং স্বদেশ-প্রেম প্রকৃতই থাকিলে, এত দিন কত ধনী সন্তানকে আমরা এই মহোচ্চ সাধু কার্য্যের জন্য অগ্রসর দেখিতে পাইতাম। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে যে গুরু ভার গভর্ণমেণ্ট এবং দেশের লোক ন্যস্ত করিয়াছিলেন, সেই গুরু-ভার বিশ্ববিদ্যালয় উত্তমরূপে উদ্‌যাপিত করিয়াছেন। যে সকল বিষয়-বিশেষে বিদ্যাদানের ব্যবস্থা না করিলে শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকে এবং ভারতের অগৌরব হয়, সেই সকল বিষয়ের সর্ব্বতোমুখী শিক্ষাদানের যথাযথ ব্যবস্থা বিশ্ববিদ্যালয় করিয়া দিয়াছেন। ভারতের নানা প্রদেশ হইতে যথাযোগ্য অধ্যাপক লইয়া আসিয়া, অপেক্ষাকৃত স্বল্পতর বেতন (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিযুক্ত অধ্যাপকগণের বেতনের তুলনায়) দিয়া, তাঁহাদিগকে বিবিধ বিষয়ে শিক্ষাদান ব্রতে নিযুক্ত করিয়াছেন। সুতরাং বলিতে হইবে যে,—বিশ্ববিদ্যালয়কে Teaching University রূপে পরিণত করিবার জন্য, দেশের লোক ও গভর্ণমেণ্ট যে ভার দিয়াছিলেন,—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, স্যর্ আশুতোষের একনিষ্ঠ অধ্যবসায় ও কার্য্যকুশলতার বলে, সেই গুরু ভার উত্তমরূপে নির্ব্বাহিত করিয়াছেন। Teaching University হইতে গেলেই অর্থ ব্যয় ত হইবেই, ইহা ত একরূপ জানা কথাই। সুতরাং বার্ষিক পাঁচ ছয় লক্ষ অর্থের প্রয়োজন পড়িতেছে দেখিয়া, এখন চমকিত হইয়া উঠিলে চলিবে কেন? যে সময়ে বিশ্ববিদ্যালয় কেবল মাত্র ছাত্রবর্গের পরীক্ষা গ্রহণ কার্য্যেই ব্যাপৃত ছিলেন, সে সময়ে আমরা দেশব্যাপী আন্দোলন শুনিতে পাইতাম যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বঙ্গদেশের ছাত্রবর্গের শিক্ষার ভার না লইয়া, কেবল পরীক্ষামাত্র লইয়াই, আপন কর্ত্তব্য শেষ করিতেছেন। কিন্তু এখন যদি সেই শিক্ষাদানরূপ মহাব্রত উদ্‌যাপন করিবার উদ্‌যোগ বিশ্ববিদ্যালয় করিতে সমুদ্যত হইলেন, যাহাতে যখনই অধিক অর্থব্যয়ের সম্ভাবনা উপস্থিত হইল,—অমনি চারি দিক্ হইতে এই প্রকার রব উত্থিত হইল যে—বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষণীয় বিষয়ের অযথা বাহুল্য ঘটাইয়া অর্থব্যয়ের 'আগুশ্রাদ্ধ' করিতেছেন'!!!

এখন আমরা আমাদের দেশবাসীর নিকটে আমাদের দ্বিতীয় বক্তব্যটী উত্থাপিত করিতে চাই। বক্তব্যটী এই যে—প্রকৃতই কি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষণীয় বিষয়গুলির অযথা বাহুল্য ঘটাইয়াছেন?

আমাদের ধারণা এই যে, যে সকল চিন্তাশীল পাঠক আমাদের পূর্ব্ব প্রকাশিত প্রথম দুইটা প্রস্তাব মনঃসংযোগ সহকারে পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই একথা স্বীকার করিবেন যে, শিক্ষণীয় বিষয়ের অযথা বাহুল্য একেবারেই করা হয় নাই। যাহা না হইলে, বিশ্ববিদ্যালয়কে Teaching University বলা সঙ্গত হইতে পারে না, যাহা না হইলে শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়, কেবল তাদৃশ বিষয়েই শিক্ষার দ্বার উদ্‌ঘাটিত করা হইয়াছে।

এই সম্বন্ধে আমরা আর একটী বিষয়ের দিকে পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষিত করিতে চাই। তাঁহাদিগকে এই কথাটীও বিশেষ ভাবে ভাবিয়া দেখিতে অনুরোধ করি। এটী ভাবিলে বিষয় বাহুল্যের কথা আদৌ উত্থিত হইতে পারিবে না বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

কে না জানেন যে, ভারতবর্ষ অন্য দেশের মত নহে। ইহা মহা প্রাচীন দেশ এবং ইহার প্রাচীন সভ্যতা বিবিধ দিগ্‌বিভমুখিনী ছিল। এক ভারতেরই প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন স্বরূপে যে সকল বিবিধমুখী বিষয় রহিয়াছে, কেবল সেইগুলির মোটামুটী জ্ঞান লাভ করিতে গেলেই

কতগুলি বিষয় বিভাগের আবশ্যক হয়! অন্যান্য নবীন দেশের ন্যায়, ভারতবর্ষ নহে। এই মহাদেশের লিপি-বিদ্যা, মুদ্রা-বিদ্যা, স্থপত্য বিদ্যা; ইহার ভৌগলিক-সন্নিবেশ বিদ্যা, শিল্প-বিদ্যা, কলা বিদ্যা; ইহার প্রশস্তি বিদ্যা অর্থ-নীতি, রাজ-নীতি; ইহার ইতিহাস, সাহিত্য, নাটক; ইহার গণিত, জ্যোতিষ, ভূবিদ্যা—প্রভৃতির কথা চিন্তা করিয়া দেখুন্। এক একটী বিষয়—এক একটা বৃহৎ বিভাগ। ইহার এক দর্শন-শাস্ত্রের কথাটাও ভাবিয়া দেখুন্ ত। এক একটী দর্শন এক একটী প্রকাণ্ড বিভাগ। কাহাকে ছাঁটিয়া কাহাকে রাখিবেন? অন্য দেশের মত, এই মহাদেশের কথা ভাবিলে চলিবে না। এই মহাদেশের প্রাচীন সভ্যতা ও বিবিধ বিষয়ক চিন্তা স্রোতের প্রণালীর কথা বিবেচনা করিতে গেলেই, নানামুখী বিষয় বিভাগ অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। বরং এই কথা ভাবিয়াই আশ্চর্য্য হইতে হয় যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কেমন সুন্দর কৌশলে অতি সংক্ষেপে বিষয় নির্ব্বাচনের কৃতিত্ব দেখাইয়া, আবশ্যকীয় তাবৎ শিক্ষনীয় বিষয়ই গুছাইয়া দিতে পারিয়াছেন। ইহা দেখিয়াও যাঁহারা অযথা বিষয় বাহুল্যের কথা পাড়িয়া, বিশ্ববিদ্যালয়কে দোষ দেন, তাঁহারা নিতান্তই অযথা দোষের আরোপ করেন, ইহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।

আমরা এ সম্বন্ধে আর অধিক কথা বলিয়া প্রস্তাব বাড়াইতে ইচ্ছা করি না। শিক্ষনীয় বিষয়-গুলির আমরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রস্তাবে যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়াছি, তাহা যাঁহারা পড়িয়া দেখিয়াছেন, তাঁহারাই আমাদিগের সঙ্গে একমত না হইয়া পারিবেন না যে, বিষয় নির্ব্বাচনে বিশ্ববিদ্যালয় কোন প্রকারেই বিবেচনার অভাব বা বিচার বুদ্ধির অভাব দেখান নাই। আবশ্যকীয় ব্যয় দেখিয়াই আজ এই বিষয় বাহুল্যের কথাটা উঠিয়াছে *। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়কে Teaching University হইতে হইবে, অথচ এক পয়সাও যেন ব্যয় না হয়—এ প্রকার অসাধ্য সাধনের আশা কি কখন সম্ভবপর হয়?

"গুরুকুল", "ঋষিকুল"—প্রভৃতিতে যাহা এখনও সম্ভবপর হয় নাই; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই বিভাগটাতে তাহা সম্ভবপর হইয়াছিল। ভারতের অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় আজ পর্য্যন্ত যাহা করিয়া উঠিতে পারেন নাই, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সেই সর্ব্বতোমুখী শিক্ষার ব্যবস্থা রচিত হইয়াছিল। অথচ এই শিক্ষা নিতান্তই 'স্বদেশী' বিষয়বহুল করিয়া, একেবারে পূর্ব্বপুরুষানুমোদিত প্রণালীরই কতকটা ছাঁচে ঢালিয়া নির্ম্মিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান সময়োপযোগী শিক্ষার সহিত, ভারতীয় প্রাচীন বিদ্যাগুলির সহিত পরিচিত হইবার সর্ব্বপ্রকার সুযোগের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই এই শিক্ষা-বিতানটাকে ধীরে ধীরে গড়িয়া তোলা হইয়াছিল। ধীরে ধীরে ইহার ছাত্রসংখ্যা বাড়িয়া উঠিতেছিল। কিন্তু নিতান্ত দুঃখের বিষয় যে, কেবল মাত্র আর্থিক অস্বচ্ছলতার দরুণ এতাদৃশ বিপুল শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানটা উঠিয়া যাইবার সম্ভাবনা দাঁড়াইয়াছে! উচ্চশিক্ষার দিকে গবর্ণমেণ্টের ঔদাসীন্যই ইহার একটা প্রধান কারণ। আর একটী কারণ—আমাদের দেশবাসীর শিক্ষা বিষয়ে উদাসীনতা এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কিরূপ বিপুল উদ্যমে এবং একনিষ্ঠ যত্নে এই মহোপকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটী পূর্ণ-কলেবর করিয়া তুলিতেছিলেন—তদ্বিষয়ে দেশবাসীর দৃষ্টিহীনতা! এই প্রতিষ্ঠানটী অর্থাভাবে একবার ভাঙ্গিয়া

* গবর্ণমেণ্ট নিজে 'দেউলিয়া' হইয়া পড়িয়াছেন বলিয়াও, আজ এই বিষয় বাহুল্যের কথাটা উঠিয়াছে।

পড়িলে, আর ইহাকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর-রূপে গড়িয়া তোলা কদাপি সম্ভব হইবে না! একবার ইহা ভাঙ্গিয়া পড়িলে, শিক্ষা-সচিবের শত কথাতেও ইহা পুনর্নির্ম্মিত হইয়া উঠিবে না? তাই বলিতে ছিলাম যে, বাঙ্গলা দেশের দ্বারদেশে, এই বিপুল দেশের ছাত্রবর্গের উচ্চ শিক্ষা লাভের উপযোগী এই শিক্ষা-পদ্ধতিটি অর্থাভাবে নষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছে, ইহাতে গভর্ণমেণ্টের সুনাম হইবে না। শিক্ষা-সচিবের প্রথম বৎসরের কার্য্যভার গ্রহণের মুখেই যদি এই বিপুল প্রতিষ্ঠানটী, তাঁহারই অবহেলায়, তাঁহারই সময়ে, নষ্ট হইয়া যায়, তদ্দারা তাহারও যশ কীর্ত্তিত হইবে না। তাই বলি, এখনও সময় আছে। অর্থ-সাহায্য পাইলে এখনও এই প্রতিষ্ঠানটী দেশের গৌরব ও সম্মান রক্ষা করিতে পারে। এ সম্বন্ধে আমাদের আরো কয়েকটী কথা বলিবার আছে। তাহা বারান্তরে বলিব।

[illegible]লেশ্বর শাস্ত্রী।

---

# পোলাও।

## দশম উচ্ছ্বাস।

ছায়া হইতেছে দীঘ শরীর দুর্ব্বল
স্থবিরতা বেড়িয়াছে জীবনের মূল
শ্লথ গ্রন্থী শিথিল ধমনী অবসাদে
কোথা শক্তি এস নেমে কিছুদিন তরে
উদ্যমে প্রবুদ্ধ করি যাপ পাথ দেখি,
ফুকারি উঠুক আজ হৃদয় বাঁশরী।
Kartophilos ওই দেখ নির্ম্মম হইয়া
যীশুরে আমার করে দারুণ প্রহার।
জগতে শান্তির রাজ্য করিতে স্থাপন
যে তেজস্বী নরসিংহ মহাসাধনায়
সিদ্ধকাম হয়েছেন; তাঁরি বুকে আজ
নিষ্ঠুরতা করিতেছে বাণ প্রক্ষেপণ।
মনুষ্যের শক্তি আভিজাত্যের গরিমা
চূর্ণীকৃত একদিন হইবে নিশ্চয়।
ভগবান্ করেছেন সত্যেরে সুন্দর,
ভগবান করেছেন ন্যায়েরে অটুট।
মঙ্গলময়ের বাক্য হইবে মধুর
অত্যাচার উৎপীড়ন পালাইবে দূর।
বিদেশের হাতে লাঞ্ছিত হতেছে দেশ
জন্মজাত অধিকার ভারতের নাই—
কোটি কোটি নরনারী—হয়েছে ভিক্ষুক
শ্রীমন্তেরা তোষামোদ কণ্ঠে বাঁধিয়াছে,
পদসেবা জীবনের হইয়াছে সার।
ভারতের অম্বরাক্ষে ভ্রূকুটি সদাই
repression সাথে লয়ে রহিছে অটল,
সত্য সহ সাহচর্য্য করেছি বর্জ্জন
সত্য আসে বুকে তার কার পদাঘাত
পদাঘাত করে যথা নির্ম্মম সার্জ্জেণ্ট
শান্তি সেনানীর বক্ষে প্রভুত্বে মাতিয়া।
ভারতের সিংহাসনে সমাসীন বীর

ঘোষিছেন চণ্ডনীতি রণরঙ্গে মাতি—
England এর prestige করিতে রক্ষণ
একশত চুয়াল্লিস—বৈদ্যুতিক পট—
গ্রামে গ্রামে জনপদে হয়েছে দোদুল
একশত চব্বিশেতে ঐ পট খানি
কে বলিবে পরিবর্ত্ত না হবে অচিরে।
শিরায় শিরায় দাসত্বের নিষ্ম গরল
প্রবাহিত কার নাহি হইতেছে আজ?
স্বাধীনতা সাধনার পূত পীঠস্থান
ইংলণ্ডের কম্রবপু, জনশক্তি সেথা
John এর মুকুট হতে লয়েছিল কাড়ি'
প্রজাসত্ব, প্রজার অবাধ অধিকার।
ভারতের জনশক্তি চাহে নাক magna carta
বিধাতার রাজ্য মধ্যে চায় তারা শুধু
বাধাশূন্য নৈসর্গিক বসন্ত-বর্দ্ধন
মানুষের কাছে চায় মানুষের দাওয়া
আত্মসম্মানের দেহ অক্ষুণ্ণ রাখিতে
ভারতের নব-শক্তি করিছে হুঙ্কার।
চায় ইহা জড়বাদী জগতের বুকে
তপোবন সমুত্থিত ভূমা হর্ষ রাশি
ঢেলে দিয়া সুশীতল করিতে ধরণী।
পতঙ্গের পক্ষচ্ছেদি নিষ্ঠুর যেমন
উড্ডীন প্রয়াস তা'র ব্যর্থতায় ভরা
নিরখিয়া মনে মনে হেসে সুখী হয়
সেইরূপ অলোলুপ শান্তি সেনা দলে
বদ্ধ করি কারাগারে শাসকের বল
মহানন্দ উপভোগ করিতেছে মনে।
গরিষ্ঠ বিধান মান শৃঙ্খলার হার
রক্ষণ করিতে আজ ন্যায়-রস-পায়ী
মহামতি রেডিং এর হৃদয় চঞ্চল!
ভারতের শান্তি সেনা চায়না রুধির
প্রেম দিয়ে চায় এরা কিনিতে, উৎকট
করাল দানব শক্তি পাশব পিপাসা
মনুষ্যত্ব দেব ভাবে সতত উদ্ধিত।

হায় ইংলণ্ড দেবভূমি, তোমার উদার
ন্যায়বাদী ভারতের বুরক্রেশী দলে
কেন ঠাঁই দিয়াছিলে কলঙ্ক কিনিতে—
এ যে বিধাতার রাজ্য যিনি পরাৎপর
যার চক্ষে ধূলি দিতে নন্দনেরা তোর
কত যত্ন করিতেছে। পৃথিবীর কাছে
ন্যায়ের কনক তুলা ধারণ করিয়া
ঘোষিছে মা উচ্চকণ্ঠে কাঁপায়ে ভুবন
'বিধির বিধান হতে ইংলণ্ড বিধান
উচ্চ যদি নাহি হয়—সমান সমান।'
পশ্চিমের প্রাণ নাই নাহিক শ্রবণ
বুভুক্ষিত স্বার্থতার চায় উপভোগ
পীড়ন যে করে তার হৃদয় ছাড়িয়া
মনুষ্যত্ব কোন দূরে যায় পালাইয়া।
একে একে নিভিছে অম্বরে নভঃশোভা
শালিপিষ্ট সম দীপ্ত নক্ষত্র নিকর।
সেবকের শ্যাম * আজ কারার গুহায়
প্রভাত কি হবে নাকো স্বপনের মাঝে?
শুনি সদা সিংহনাদ শার্দ্দূল গর্জ্জন।
করি নাকো রাজ্য লোভ, হে ক্ষাত্রইংরাজ,
রোষোদ্দেল চিত্তে তব প্রাচ্য শান্তিরাশি
ঢেলে দিয়ে ঋষিকল্প করিতে তোমায়
ভারতের বীরগণ উঠেছেন জাগি।
তব কষ্ট নেত্র মাঝে দেখিবারে পাই
সেই মূর্ত্তি, যে সময় কাননে কাননে
রঙ মেখে নগ্নভাবে করিতে অটতি
বাহ্য সভ্যতার ধার ধারি না আমরা
আধ্যাত্মিক অমরতা উপলব্ধি করি
সারাৎসারে পেতে প্রাণ সতত আকুল,
আত্মশুদ্ধি আত্মজয় মুক্তির কারণ।
পশ্চিম কি সে শুচিতা করিবে গ্রহণ?
পুলিশ আকাশে কভু উঠে নাই চাঁদ
উজ্জ্বল নক্ষত্র কভু দেয় নাই দেখা।

* শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী।

আজ ঐ নভোপরে অভিনব শশী
আনন্দে ভরিতে মন হল সমাসীন।
শরতের চাঁদ হারায়েছে কান্তি তার
হে তেজস্বি পূর্ণচন্দ্র তোমার আলোকে
শত সহকর্ম্মি চিত্ত উঠিবে ফুটিয়া।
দেশের গৌরব বৃক্ষ প্রফুল্ল ও আজ
গ্রামে গ্রামে চরকার গুণ গাথা নিয়া
গান্ধীজির শিববাক্য করিছে ঘোষণা,
A day, an hour of virtuous liberty
Is worth a whole eternity of bondage
স্নেহে ধন্য আছিলাম সুরেন্দ্র তোমার
সিসিরোর কণ্ঠ হারা বাগ্মী শির শোভা!
আত্মহত্যা মহা পাপ এ কথা জানিয়া
কেন ভদ্র হেন কার্য্য করিলে সাধন?
আজ তুমি রোটাণ্ডার ভূষিত ভবনে
তাহাদেরই সঙ্গে রঙ্গে পূজিছ হরষে
উদ্দাম যৌবনে যারা তোমা সম ভাবি
ভস্ম করে দিয়েছিল পীন কটিখানি
সেই আঘাতেতে তুমি বিক্ষুব্ধ হইয়া
সিন্ধু গরজন করি উঠেছিলে বলি'
Lo in liberty's unclouded blaze
We lift our heads, be what it may
আশার সহস্রদীপ একটী ফুৎকারে
নির্ব্বাপিত করেছিল বল দেখি কারা?
দিবসের ছাদ ভরা সুখের আলোক
ক্ষমতার ব্যগ্রগতি উদগ্র প্রভুত্বে
দল বেঁধে লয়েছিল কারা বল কাড়ি?
মনে হয় সেইদিন গোরাগত প্রাণ
পরম বৈষ্ণব সাধু শিশিরকুমার
তোমাতরে জান নাকি কাঁপায়ে কানন
কাঁপায়ে নিখিল বঙ্গ তুলেছিল রোল
গঙ্গা গোবিন্দের তেজ ফুটুক তোমাতে
Repression tank ঐ চালাইছে Jehu
বুক দিয়ে আরও তুমি ঠেলে দেও সখা
চণ্ডনীতি সদা প্রস্থ নিমেষে নিমেষে
বিদ্রোহ প্রসব করে কেনা জানে উহা?
( হে সচিব ) ম্যালেরিয়া পুতনার বালকৃষ্ণ তুমি
দেখিতেছ জনসিন্ধু সদা অচঞ্চল
প্রতিহিংসা পোড়ায়েছে ভালবাসা দিয়া
প্রাচ্য নহে রুধিরের উদ্দাম পিপাসু
ঐ যে তপস্বীর গেহ ঐ দেখ দূরে

মহা সাধনায়, ত্রাতা সিদ্ধি লাভ করি
করিছেন জনগণে পীযূষ প্রদান।
কোথা হতে এল বল নিস্তব্ধ অভাব
তোমার এ নিদারুণ স্বর্ণ পিপাসা
দেখ্যু দৈন্য নিপেষিত করিছে বাঙ্গালী
শাসকের শুষ্ক চক্ষু সাহারা হৃদয়

ছিল না সংযম তাই সহস্র যুবক
ভেবেছিল গুপ্ত হত্যা প্রাণের উপায়
তাই তার বিপ্লবের দারুণ আগুন
ক্ষমতার দীপানল মরেছিল পুড়ি।
এ জগতে বীর বলে কারে আখ্যা দেও
নিরস্ত্র শিরে যারা ঐ যে জেঙ্কিন্স
দোর্দ্দণ্ড প্রতাপশালী পাতত কাইজার
বার যদি চিন্তা করে অবার কে তবে?
হে সুরেন্দ্র সেই দিন মনে কিছে হয়
শালগ্রাম শিলামান অক্ষুণ্ণ রাখিতে
জষ্টিস নরিস মুখে দেখেছিলে তুমি
নির্দ্দয়তা ভরা সেই জেফিরির ছবি!
সুহৃদ অশ্বিনী কুঞ্জ ঐ ফরিদপুর
গ্রাজুয়েট তুমি ভদ্র, দেখহ নিতম্ব
বেতের আঘাতে উহা জর্জ্জরিত কি না?
ভারত আপন ধৈর্য্য কাঙ্গাল সন্তানে
দান করেছেন, তাই শত অপমানে
ধৈর্য্যচ্যুত কোন দিন হইবে না এরা
তুমি মাতৃহীন দাদা আমি ওগো তাই
চেয়ে দেখ ঐ মূর্ত্তি নারীর গৌরব
যার চক্ষে জল জল জলিছে অনল
যার বপু হতে ঝরে মর্য্যাদার ধারা
যার প্রাণ বিমণ্ডিত অটুট বিশ্বাসে
ধর্ম্মের রাখিতে মান যে মহিলা আজ
যুগল তনয়ে দেয় সিংহের কবলে
ওই ওই ওই দেবী ওই দেবতার
মা বলে বারেক ডাক প্রাণের সুরেন
দূরে যাবে দুঃখ, হবে উজ্জ্বল সুন্দর।
নির্জ্জনে বসিয়া আমি উদ্দেশে দেবীরে
মা, মা, মা, মা, ডাকি কতবার
যতবার ডাকি প্রাণে নব বল আসি
আমার প্রাণেরে করে তারুণ্য প্রদান
ওই কেশরিণী দুগ্ধে পুষ্ট যে শাবক
তার বীর্য্য দেখিলে কি দাদাটী আমার

Prestige prestige how many crimes
Are committed in thy name ?
নূতন আদেশ বহি নব বুদ্ধদেব
মুক্তির বারতা আজ এনেছেন হেথা
নবীভূত হয়ে বিশ্ব উঠিছে হাসিয়া
প্রদোষে উষার রাগ আকাশের গায়।
নিষ্ঠুরতা কেশরীর ক্ষুধা হলে দূর
শান্তির হৃদয়ে সে গো পড়িবে ঢলিয়া।
বিশ্ব হ'তে মনুষ্যত্ব গিয়াছে যে সরে
অবীচির অধিপতি Molach mamon
অধিকার করিয়াছে নিখিল জগৎ
অদিতির সনে আজি দিতির আহব
এ আহবে রক্ত নাই প্রাণীর নিধন
নাহি দ্বেষ, প্রতিহিংসা। আছে প্রেমদান
দৈত্যকে অমৃত দানে করিছেন দেব
ভারতের নবীভূত দ্রোণাচার্য্য বার
সর্ব্ব অঙ্গে মাখিয়া দৈন্য বিনয় বৈষ্ণব
ধরেছেন স্বর্গচিত্তে জ্যোতির্ম্ময় জ্যোতি
ঐ জ্যোতি কাঙ্গালের ক্ষুধা কেড়ে লয়
পিশুনের বুকে ঢালে সরলতারাশি
জাগাইয়া তোলে প্রাণ মাতৃমমতায়
সত্যের হোমাগ্নি শিখা চিত্তমাঝে জাগে
আজ বঙ্গ কবিকুঞ্জে উদ্দীপনা নাই
সেফালি কর্ণিকা রসে সিক্ত সিচয়ায়*
প্রসাধিতা প্রমোদার পিঁড়িতে বসিয়া
"কিরণ" উজ্জ্বল রসে দিতেছে সাঁতার
মরালের কলধ্বনি করিয়া শ্রবণ
মনে ভাবে প্রেয়সার যাবক রঞ্জিত
কঞ্জ চরণের হবে নূপুর নিক্কণ।
সূক্ষ্মদর্শী প্রিয়ভাষী ঠাকুর সুধীন
তালীবন অন্তরালে শেলী ও কীটসের
অপরূপ সমবায় নিরীক্ষণ করি
লুকে নিয়ে করুণায় আবিষ্কার কথা
জানাইল গৌর জনে, সেইদিন হতে
হর্ষে মকরন্দ ধারা এই গৌড়বাসী
পান করি চরিতার্থ হয়েছিল সব।
এই আদরের কবি আমার করুণা
প্রকৃতির রস পায়ী সোহাগের নিধি
আজ কিনা শুভ্র পদ্ম তড়াগে নামিয়া
পরাগে মাখিয়া হাত আহরণ করি
য়্যানিভার্সিটির যিনি বিধাতাপুরুষ
বিধাতার বলে যিনি Equityর রাজা
অমিত বিক্রমশালী তেজস্বী পুরুষ
সেই আশুতোষে অর্ঘ্য করিছেন দান।
হোথায় রাজেন্দ্র দেব ললাটে যাহার
ভাগ্য দেবী দিয়াছেন প্রাচুর্য্যের টীপ
ঐ বসে কালিদাস কাব্য কামধেনু
ঐ বসে রসময় রসিক প্রবর
ওকে ওকে ঐ বুঝি জীবেন্দ্রকুমার
আরও কত পাত্র মিত্র রয়েছেন বসি
হায় সখি কেমনে বর্ণিব এ সভা গৌরব।
ইচ্ছা করে তোমাদের হাঁড়ি বেঁধে গলে
অমন মরীচি মাখা ভাগ্য সরোবরে
ঝাঁপ দিয়ে দৈন্য হাত লভি পরিত্রাণ।
শুভক্ষণ উপস্থিত মুক্তি সন্নিকট
বাঙ্গালার কবিবৃন্দ হায়রে কপাল
প্রোষিতার মনোভাব মনের আকৃতি
চাঁদের শীতল বুকে আছে যেন লেখা
নিথর নয়নে তাই শশী পানে চেয়ে
সুধার আখরে লেখা প্রিয়ার মানস
বিরহ বেদনা রেখা করি অধ্যয়ন
মন্দীভূত করিছেন সন্তাপ অনল।
বাঙ্গালার কবিকুঞ্জে নাহি কি "রমেশ"
উদ্দীপনা অগ্নি জ্বালি দেশে জ্বালে আলো
শিথির অটল কবি "সত্যেন" সুন্দর
পল্লবিত বাক্ অঙ্গ "চটুল কুমুদ"
উচ্ছ্বসিত রশ্মি সুধী সুধীর কুমার
লাবণ্য স্ফুরিত ভাব মধুর সুরেশ *
এত কবি কাব্যে কেন উদ্দীপনা নাই ?
নব্যভারতের কবি প্রাণের গোবিন্দ
তাঁরে স্মরি আজ আঁখি আসিছে ভিজিয়ে
'স্বদেশ স্বদেশ করিস্ তোরা এ দেশ তোদের নয়'
নিশীথে মানস পাখী ওই গীত খানি
ভারতের আকাশেতে কেঁদে কেঁদে গায়।

শ্রীবেনোয়ারীলাল গোস্বামী।

* বস্ত্র।

* উদীয়মান কবি। ইহার প্রতি প্রবন্ধই মাধুর্য্য মাখা—লেখক।

# সঙ্গণিকা।

বৎসর শেষ হইতে চলিল। বৎসরটা যেন সর্ব্বরকমেই দুর্ব্বৎসর। দেশের প্রায় সব নেতাই কারাগারে। মহাত্মা গান্ধী এতদিন বাহিরে ছিলেন। এবার তিনিও ধৃত হইয়াছেন। রাজদ্রোহিতার অপরাধে তাঁহার ছয় বৎসর বিনাশ্রমে কারাবাসের হুকুম হইয়াছে। যে অপরাধে তাঁহাকে ধরা হইয়াছে সম্প্রতি তাহার কোন নূতন কারণ উপস্থিত হয় নাই বা বাড়িয়া। যায় নাই বরং কমিয়া গিয়াছিল। কেন না বরদোলি সিদ্ধান্তের পর তিনি তাহার ব্যাপক ভাবে আইন অমান্য করার সমস্ত সংকল্প ও ব্যবস্থা উঠাইয়া শান্তির প্রচারে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। এই সময় কেন যে তাঁহাকে ধরা হইল কেহ তাহার কারণ বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছেন না।

মহাত্মা গান্ধী প্রতিক্ষণই জেল যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইয়া বা প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়াছিলেন। তাঁহার পক্ষে ইহা কষ্টকর হয় নাই। তাঁহার বিরোধী ইংরাজ সংবাদপত্রগুলিও তাঁহার ব্যক্তিগত চরিত্র ও ব্যবহার সম্বন্ধে নির্দ্দোষ ও একান্ত খাটি বলিয়া প্রশংসা করিতে বিরত হয় নাই এবং এই সময়ে তাঁহাকে ধরিবার কোন কারণ তাহারাও বুঝিতেছেন না বলিয়া ও এ সময় ধরাটা সমীচীন হয় নাই বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। যাহা হউক আইনের বিচারে তাঁহার অপরাধ সাব্যস্ত হইয়াছে। তিনি বিচারকালে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন যে, আইনের চক্ষে তিনি দোষী কিন্তু মুক্তি পাইলে আবারও তিনি এইরূপ অপরাধ করিবেন। কারণ মানুষের স্বাধীনতাকে যে সব আইন খর্ব্ব করিয়াছে সেই সকল আইনকে অমান্য করিতে শিক্ষা দেওয়া তিনি তাঁহার ব্রত বলিয়া মনে করেন তাই তাহা অমান্য করিতে তিনি কুণ্ঠিত নহেন। এবং এই সকল আইনের প্রতি তাঁহার কোন প্রীতি নাই কাজেই এইগুলির প্রতি অপ্রীতি জাগাইতে তিনি সর্ব্বদাই প্রয়াস পান। সুতরাং বর্ত্তমান শাসনতন্ত্রের প্রতি অপ্রীতি জাগাইতে চেষ্টা করার অভিযোগ তিনি সত্য বলিয়া স্বীকার করেন এবং তজ্জন্য রাজনিগ্রহ অকুণ্ঠিত চিত্তে গ্রহণ করিতেও তিনি স্বীকৃত আছেন। এই স্বীকারোক্তির উপর নির্ভর করিয়া বিচারক মহাত্মাকে ৬ বৎসরের বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন।

খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারক রেভারেণ্ড হোমস্ বলেন যে, আমি যখন রোমার কথা স্মরণ করি তখন আমার ঋষি টলষ্টয়ের কথা মনে পড়ে, লেনিনের কথা যখন মনে করি তখন নেপোলিয়নের কথা মনে পড়ে কিন্তু যখন মহাত্মা গান্ধীর কথা মনে করি যীশু খ্রীষ্টের কথা মনে পড়ে। যীশুর মতনই এই মহাত্মা জগতের মঙ্গলের জন্য আত্মদান করিয়াছেন। কর্ম্মক্ষমতা ও ভাবুকতার এমন অপূর্ব্ব সমন্বয় জগতে আর বড় দেখা যায় না। গান্ধীই বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠতম পুরুষ।" মহাত্মার কর্ম্মপদ্ধতির সহিত সকলের মতের মিল না হইতে পারে; অনেকে তাহার প্রতিবাদও করিয়াছেন কিন্তু তাঁহার জীবনের মহত্ত্বের কথা তাঁহার বিরোধীরাও অস্বীকার করেন না। তাঁহার বিচার ফল বাহির হইবার দিন একজন রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায় ভুক্ত ইউরোপীয় মহিলা ( nun ) তাঁহার অল্প বয়স্ক বাঙ্গালী ছাত্রীকে অত্যন্ত উদ্বিগ্নভাবে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন গান্ধীর কোন খবর তাহারা জানে কি না? তিনি তাহাদিগকে মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন যে "Do you know anything about Mr. Gandhi? I am very anxious about him, he is a very good man. I like him very much. He cannot do wrong and I hope he will be set free." তাঁহার খবরের জন্য আমি খুব উৎকণ্ঠিত হইয়া আছি। তিনি অতি মহৎ লোক আমি তাঁহাকে খুব পছন্দ করি। তিনি অন্যায় করিতে পারেন আমি মনে করি না। আশা করি তাঁহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। এই সামান্য কথাটী উদ্ধৃত করিবার উদ্দেশ্য এই যে, তাঁহার

ব্যক্তিগত চরিত্রের প্রতি জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে সকল শ্রেণীর সকল লোকের কতখানি শ্রদ্ধা আছে ইহাতে বুঝা যায়।

মহাত্মাগান্ধীর বিচার করিতে গিয়া বিচারক বলিয়াছেন 'Nevertheless it will be impossible to ignore the fact that you are in a different category from any person I have ever tried or am ever likely to have to try. Also it would be impossible to ignore the fact that in the eyes of millions of your countrymen you are a great patriot and a great leader or that even those who differ from you in politics look up to you as a man of high ideals and leading a noble and even a saintly life. "আমি জীবনে যত লোকের বিচার করিয়াছি বা পরে করিব আপনি তাহাদের সকলের অপেক্ষা সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধাতুর (শ্রেণীর) লোক। এবং ইহাও অস্বীকার করা অসম্ভব যে আপনি আপনার দেশের লক্ষ লক্ষ লোকের চক্ষে খুব বড় একজন নেতা ও দেশহিতৈষী এমন কি যাহারা রাজনীতিতে আপনার সঙ্গে একমত নহেন তাহারা ও আপনাকে খুব উচ্চদরের মনোভাব সম্পন্ন লোক এবং আপনার জীবনকে মহৎ এমন কি সাধুর জীবন বলিয়া মনে করিয়া থাকেন।" এবং আরও বলিয়াছেন যে লোকমান্য তিলকের প্রতি যে শাস্তি দেওয়া হইয়াছিল তাহার অনুসরণে ৬ বৎসর এই গুরুদণ্ডে তাঁহাকে দণ্ডিত করা হইল তথাপি দেশের অবস্থা অন্যরূপ হইলে শাস্তির মেয়াদ ফুরাইবার পূর্ব্বেই সম্ভবতঃ তাঁহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইতে পারে। এবং তাহা হইলে তিনি (বিচারক) সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুখী হইবেন।

কিন্তু আমলাতন্ত্রের শাসন পদ্ধতির মর্য্যাদা রক্ষার জন্য যে আইন কানুনের সৃষ্টি হইয়াছে তাহা যন্ত্রের মত চলে, ব্যক্তি বিশেষের জন্য তাহার ব্যতিক্রম হয় না। কর্ম্মের ফল দেখিয়া কর্ম্মকর্ত্তার বিচার করাই তাহার রীতি। কর্ম্মকর্ত্তার শুভ আকাঙ্ক্ষার কোনও মূল্য তাহার নিকটে নাই। কর্ম্মফল যদি আমলাতন্ত্রের মতের অনুকূল না হয় তাহা হইলে আইনের উদ্যত প্রহরণ তাহাকে আঘাত করিবেই।

তাঁহাকে দণ্ডিত করিলে পর দেশবাসীর কি করা উচিত হইবে তাহা মহাত্মাগান্ধী প্রায় একমাস পূর্ব্বে বিশেষভাবে বলিয়াছিলেন। তিনি বিশেষ ভাবে বলিয়াছিলেন যে, তিনি যখন কার্য্যক্ষেত্র হইতে অন্তরালে থাকিবেন তখনও যদি জনসাধারণ অহিংসভাবে অসহযোগ আন্দোলন চালাইতে পারে তবেই তাহাদের অহিংসভাব শিক্ষা হইয়াছে কি না বুঝা যাইবে। তাঁহাকে একজন ভগবান বা ভগবানের অবতার ভাবিয়া তাঁহার কথা পালন করিলে তাহার সার্থকতা হইবে না। কিন্তু তাঁহার অনুপস্থিতিতেও যদি তাহা পালন করিতে পারা যায় তবেই তাহা জীবন গত হইয়াছে বলিয়া বুঝা যাইবে ও জীবন গত হইলেই তাহার সার্থকতা হইবে।

বরদোলি সিদ্ধান্তের পর ব্যাপকভাবে আইন অমান্য ব্যাপার তুলিয়া লওয়াতে কেহ কেহ তাঁহার উপর দুঃখিত ও বিরক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার যেরূপ সত্যনিষ্ঠা ও খাঁটি জীবন যাপন প্রণালী, আমরা যদি প্রত্যেকে তাঁহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া প্রতি খুঁটিনাটিতে সেইরূপ খাঁটি হইয়া চলিতে পারি তবে আমরা যে তাঁহার প্রদর্শিত স্বরাজ লাভের পথে অগ্রসর হইতে পারিব তাহা স্বতঃই মনে হয়।

অনেকে মনে করেন তিনি স্বরাজ যতটা চাহিয়াছেন তাহা অপেক্ষা পৃথিবীতে সত্য ও শান্তি স্থাপন বেশী ভাবে চাহিয়াছেন। ভারতের স্বাধীনতা অপেক্ষা সত্য তাঁহার নিকট বেশী বড়। তাঁহার মত মহাত্মার ইহাই শোভা পায়। এ কথা না বলিয়া, যে ভাবেই হউক দেশের স্বাধীনতাই মাত্র আমাদের প্রার্থনীয় সামগ্রী, ইহা বলিলে তাঁহার উপযুক্ত

কথা হইত না। আজ যে শত্রুমিত্র নির্ব্বিশেষে, জাতি বর্ণ নির্ব্বিশেষে তাঁহাকে সম্মান দিতেছে ও শ্রদ্ধা প্রকাশ ( প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে ) করিতেছে ইহা তাঁহার সত্যানুরাগ ও সত্য-জীবনের ফলস্বরূপ নহে কি? যাহার ব্যক্তিগত জীবন খাঁটি তাঁহার অন্য সব দিকের জীবন ও যে খাঁটি হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। কেন না অকৃত্রিমতাই তাহার ব্যক্তিত্ব। ব্যক্তিগত জীবন খাঁটি না হইলে বেশী দিন লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়া থাকা সম্ভবপর নয় একদিন না একদিন উহা ভাঙ্গিয়া যাইবে। আমরা সাধারণ যদি এইরূপ ভাবে সকল বিষয়ে সকল রকমে ও সকলের সম্বন্ধে খাঁটি হইতে পারি আমাদের উন্নতিতে বাধা দিবে সাধ্য কার?

* * * *

মিঃ মণ্টেগুর পদত্যাগ। বিগত যুদ্ধের পরে ফ্রান্সে যে সন্ধিপত্র হইয়াছিল তাহাতে তুরস্কের প্রতি অশান্ত অবিচার হইয়াছিল এবং মুসলমানদের খলিফা, তুরস্কের সুলতানের ক্ষমতা কার্য্যশক্তি ইত্যাদি কমাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। সেইজন্য ভারতবর্ষের মুসলমানেরা অসন্তুষ্ট হইয়া রহিয়াছেন। ভারতগবর্ণমেণ্ট (বোধ হয় শান্তিস্থাপনে ...ক প্রয়াসী হইয়া) মুসলমান দিগকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টদের সহিত পরামর্শ করিয়া ও ভারত সচিবের সম্মতি লইয়া ইংলণ্ড মন্ত্রসভাকে ঐ সন্ধির বিষয় কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করিতে অনুরোধ করেন। তাঁহাদের অনুমতি না লইয়া এই বিষয় প্রকাশ করিয়া দেওয়ায় ভারত-সচিব মিঃ মণ্টেগু পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। ইহা তাঁহার পদত্যাগের উপলক্ষ্য বা মুখ্য কারণ হইলেও গৌণ কারণ আরও আছে। উদারনৈতিক দল যাহাতে পার্লেমেণ্টে প্রভুত্ব করিতে না পারে রক্ষণশীল দলের দিক হইতে তাহার খুব চেষ্টা হইতেছিল। লয়েডজর্জ রক্ষণশীল দলকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য সচেষ্ট ছিলেন বোধ হয় এবং মণ্টেগুর কার্য্যাবলী রক্ষণশীলদিগের মনঃপূত ছিল না। শোনা যায় মহাত্মা গান্ধিকে অবরুদ্ধ না করাতে তাঁহারা মণ্টেগুর প্রতি বিশেষ ভাবে বিরক্ত ছিলেন। এই সব নানা কারণে মণ্টেগুর ক্ষমতা অনেকদিন হইতেই টলিতেছিল। বর্ত্তমান ব্যাপারটাকে উপলক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে কার্য্য হইতে সরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। যদিও বর্ত্তমান শাসনসংস্কারে তিনি অনেক গোলের সৃজন করিয়া ফেলিয়াছেন তথাপি তিনি ভারতের অকৃত্রিম হিতৈষী এবিষয়ে কাহারও সন্দেহ নাই। তাঁহার এই অপসারণে ভারতবাসী মাত্রই দুঃখিত হইয়াছে।

* * *

ধর্ম্মঘট। আজকাল চারিদিকেই ধর্ম্মঘট হইতেছে। আর্থিক অবস্থাই প্রধানতঃ ধর্ম্মঘটের কারণ। বর্ণ ও জাতীয় বৈষম্য এবং তজ্জনিত অসন্তোষ ও অনেক স্থলে এই সকল ধর্ম্মঘটের কারণ। দেশীয় কর্ম্মচারীদের উপর ইউরোপীয় কর্ম্মচারীদের কুব্যবহার, দেশী বিদেশীর বেতনের তারতম্য প্রভৃতি দেশীয় কর্ম্মচারীদিগকে অসন্তুষ্ট করিয়া তুলে। E I Ryএর ধর্ম্মঘট এইরূপ অন্যায়ের প্রতিকারকল্পে ঘটিয়াছে বলিয়া ধর্ম্মঘটীরা প্রকাশ করিয়াছেন। রেলে ইউরোপীয়েরা অনেক স্থলে দেশীয়দের প্রতি দুর্ব্যবহার করেন ইহা অমূলক নহে। কৃষ্ণ ও শ্বেতকায় কর্ম্মচারীর বেতনের তারতম্য ও কম নহে। এই সকলের প্রতিকার না হইলে বর্ত্তমান ধর্ম্মঘট ভাঙ্গিয়া গেলেও অদূর ভবিষ্যতে আবার বিশৃঙ্খলা ঘটিবেই। Indian mining associationএর বার্ষিক সভায় মিঃ পাটিনসন ধর্ম্মঘট সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিয়াছেন তাহা অতীব সত্য। তিনি বলেন "There have been several cases reported to us of assaults on the labour by those in authority at the collieries and the committee have issued circulars asking members to warn their colliery staff that the labour must not be assaulted. No one has the right to assault any of his labour. If the labour

is assaulted and the assault causes a strike then you can only blame yourselves"

ধনীর শ্রমীর আত্মমর্য্যাদা জ্ঞানকে ক্ষুণ্ণ করিবার কোনই অধিকার নাই। যদি কোনও ধনী শ্রমীর আত্মমর্য্যাদা হরণের প্রয়াস পায় এবং শ্রমী দল বাঁধিয়া ধর্ম্মঘট করে তজ্জন্য ধনীই দায়ী। এই কথা স্মরণ রাখিয়া যদি রেল কর্ত্তৃপক্ষ বিচার করিতেন তাহা হইলে E. I. Ryএতে ধর্ম্মঘট হইয়া জনসাধারণের অসুবিধা হইত না। ধর্ম্মঘটীদের অভিযোগ যে রামলাল নামক একজন কর্ম্মচারীকে দুইজন ইউরোপীয় কর্ম্মচারী প্রহার করায় কর্ত্তৃপক্ষের নিকট তাহারা প্রতিকার প্রার্থনা করে। প্রথমে রেল কর্ত্তৃপক্ষ রামলালের প্রতি অত্যাচারের কথা অস্বীকার করিয়াছিলেন। এখন লোকো সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের রিপোর্টে প্রকাশ যে, 'প্রহার অতি সামান্যই হইয়াছিল তজ্জন্য ধর্ম্মঘট অনুচিত'। কিন্তু নিম্নশ্রেণীর কর্ম্মচারীদিগকে প্রহার করিবার অধিকার কি ইউরোপীয় কর্ম্মচারীর আছে? কর্ত্তৃপক্ষের ইহার প্রতিকারের ব্যবস্থা করা উচিত।

* * *

মান্দ্রাজের হাঙ্গামার পুলিসের দায়িত্ব সম্বন্ধে যে তদন্ত হইয়াছিল তাহার ফল সরকার পক্ষ বাহির করিয়াছেন। তাহাতে কতকগুলি পুলিশ কর্ম্মচারীর বিচার বিভ্রম (error of judgment) হইয়াছিল বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। আজকালerror of judgment যেন পুলিশের মধ্যে সংক্রামক হইয়া উঠিয়াছে এবং ফলে অনেক স্থলে ভারতবাসী প্রাণ হারাইয়াছে। কালিঘাট, হাওড়া, মাটিয়ারি ও মান্দ্রাজে এইরূপ ঘটনা ঘটিল। অনেক স্থলে শোনা যায় যে গুলি চলিয়াছে কিন্তু কাহার হুকুমে তাহা জানা যায় না এমন কি এতদূরও শোনা যায় যে বিনা হুকুমেও নাকি কোথাও কোথাও গুলি চলিয়াছে। ইহার কি কোনও প্রতিবিধান নাই? ব্যবস্থাপক মণ্ডলী হইতে এইরূপ ব্যবস্থা করা উচিত যাহাতে গুলি চলা বা error of judgment এত সুলভ না হইতে পারে।

বজেট। ব্যবস্থাপক সভায় ভারতীয় আয়ব্যয়ের তর্ক বিতর্ক আরম্ভ হইয়াছে। তর্ক বিতর্ক ভিন্ন কার্য্যে যে কিছু হইবে সে আশা নাই। এই দরিদ্র দেশে ব্যয়সংকোচ না করিয়া শুধু ট্যাক্স বৃদ্ধির দ্বারাই কি দেশ সুশাসিত হইতে পারে? প্রস্তাব হইয়াছে লবণ দিয়াশলাই ও কেরোসিনের উপর শুল্ক বসিবে, ট্রেনভাড়া ও ডাক মাশুল বৃদ্ধি হইবে। এদেশ যেরূপ দারিদ্র বেশীভাগ দরিদ্রলোক শুধু "নূন ভাত বা নূনছাতু" খাইয়া দিন গুজরাণ করে। দিয়াশলাই লবণ ও কাপড় কি ধনী কি দরিদ্র কাহারও না হইলে চলে না, এইগুলি নিত্যনৈমিত্তিক জীবনের অতিপ্রয়োজনীয় সামগ্রী। এই সব জিনিসের উপর শুল্ক বসাইলে দরিদ্রদের অত্যন্ত ক্লেশ হইবে। যে শুল্কে ধনীর বিশেষ কষ্ট হয় না কিন্তু দরিদ্রকে বিশেষ ভাবে আঘাত করে, এমন কি দিন গুজরান কষ্টকর হয় তাহা করিলে প্রজা পালন না হইয়া শোষণই হয়। অন্নহীন দেশে, ক্ষুধার্ত্তের অন্নের অতি সামান্য অথচ অতি প্রয়োজনীয়—না হইলে চলে না—এমন উপকরণ মহার্ঘ্য করা উচিত নয়। *

* * * *

## ঐক্য মণ্ডলী।

অযোধ্যার শাণ্ডিলা তহশিলে মাদারী পাশি নামক এক ব্যক্তি "ঐক্য" নামে এক দল গঠন করিয়াছেন। তাহাদের ১১টী সর্ত্ত আছে। সর্ত্তগুলি এই

---

* পরে সংবাদ আসিয়াছে যে ভারতীয় ব্যবস্থাপক মণ্ডলী মিঃ যোশির প্রস্তাবে লবণের উপর কর বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। কাপড়ের শুল্ক বৃদ্ধি প্রস্তাবও যথেষ্ট হইয়াছে সরকার পক্ষের বিরুদ্ধে এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য হওয়াতে (Democratic) গণতান্ত্রিক দল দেশের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

১। জমিদার বে-আইনি ভাবে জমি হইতে তাড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিলে প্রজারা তাহাদের জমি ছাড়িয়া দিবে না।

২। কেবল মাত্র আইন সঙ্গত নির্দ্ধারিত খাজানা দিবে।

৩। খারিফ ও রবি এই দুই কিস্তিতে নিয়ম মত শান্তে দেয় খাজানা দিবে।

৪। রসিদ না লইয়া খাজানা দিবে না।

৫। জমিদারদের নিকট ( পয়সা না লইয়া ) অতিরিক্ত বেগার খাটিবে না।

৬। হরি এবং ভূশা নামক অতিরিক্ত খাজানা দিবে না।

৭। পুষ্করিণীর জল চাষের জন্য জলকর না দিয়া ব্যবহার করিবে।

৮। বিনা করে জঙ্গলে ও গোচারণ মাঠে গৃহপালিত পশুদের চরাইবে।

৯। গ্রামে অন্যায়কারী বা অপরাধীর সাহায্য করিবে না।

১০। জমিদারদের অত্যাচারের প্রতিবাদ করিবে।

১১। আদালতে না যাইয়া পঞ্চায়েতের সকল সালিশী মানিবে।

এই সর্ত্তে আবদ্ধ হও যে সময় প্রত্যেকে চারি আনা করিয়া চাঁদা দেয়। অনেকে ইহাকে রাজনীতি সংক্রান্ত বা অসহযোগ আন্দোলনের সহিত ইহার সংস্রব আছে বলিয়া আশঙ্কা করিতেছিলেন কিন্তু উপরোক্ত এগারটী সর্ত্ত ও পত্রিকার প্রকাশ পায় যে ইহার সহিত রাজনীতির কোন সংস্রব নাই। মাদারীপাশি তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর লোক কিন্তু তাহার গুণে সকল লোক তাহার আনুগত্য স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। হরদই এর ডেপুটী-কমিশনার সম্প্রতি এক রিপোর্টে প্রকাশ করিয়াছেন যে ঐক্য আন্দোলন এখনও সম্পূর্ণ বৈধভাবে চলিতেছে। ইহাদের সম্বন্ধে যে সব অভিযোগ শোনা গিয়াছে তাহার অধিকাংশই অতিরঞ্জিত। এই আন্দোলন প্রধানতঃ অশিক্ষিত লোকদের মধ্যেই আরম্ভ হইয়া সেইখানেই আবদ্ধ আছে। এই যে জন মনের জাগরণ ইহা দেশের পক্ষে অতি শুভ লক্ষণ ও আশার পরিচায়ক। যাহাতে ইহা সত্য ও ন্যায়ের পথে চলিতে পারে তাহার জন্য শিক্ষিত লোকের সহানুভূতি ও সহযোগ বাঞ্ছনীয়।

* * * *

নব্যভারতের কি যে দুর্ব্বৎসর। আবার এক অকৃত্রিম সুহৃদ ও লেখককে অকালে হারাইতে হইল। চট্টলার কবি জীবেন্দ্রকুমার দত্ত অল্প বয়সে সকলকে শোক বিদ্ধ করিয়া মহা-প্রস্থান করিয়াছেন। বর্ত্তমান সংখ্যায় তাঁহার এক কবিতা প্রেসে যাওয়ার পর অকস্মাৎ এ দুর্ঘটনার সংবাদ আসে। কবিতাটীতে তিনি যেন মহাপ্রয়াণের আভাস পাইয়াছিলেন। নব্যভারতে তাঁহার প্রথম হাতেখড়ি হয় বলিলে বিশেষ অত্যুক্তি হয় না। শেষ কবিতাটীও নিজে হাতে পাঠাইয়া দিয়া গিয়াছেন। সম্প্রতি তাঁহার কবিতা প্রায় সমস্ত বাঙ্গালা মাসিকপত্রিকাতেই প্রকাশিত হইত। নিজ জন্মভূমি চট্টগ্রামের প্রতি তাঁহার অসাধারণ অনুরাগ ছিল। নবীনচন্দ্রের অন্তর্ধানের পর জীবেন্দ্রকুমার ধীরে ধীরে কাব্যজগতে উচ্চাসন গ্রহণ করিতেছিলেন। আশা হইতেছিল, চট্টলার যে সুমধুর বীণা নীরব হইয়া গিয়াছিল, সুরে তালে সেইরূপ না হইলেও জীবেন্দ্রকুমারের কাব্য আবার তাঁহার সাধের চট্টলাকে ঝঙ্কৃত করিয়া তুলিবে। চট্টলার দুর্ভাগ্য। তাঁহার বাঁশরী বাজিতে না বাজিতে অকালে থামিয়া গেল! নব্যভারতের দুর্ভাগ্য! ইহার বর্ত্তমান অসহায় অবস্থায় তিনি নব্যভারতের সেবার জন্য তাঁহার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিতে, এমন কি, সাধের চট্টলা ছাড়িয়া আসিতেও ব্যগ্র হইয়াছিলেন। নব্যভারত এমন অকৃত্রিম সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইয়া বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। আমরাও তাঁহার পরিবারবর্গের সহিত সমবেদনাগ্রস্ত হইয়াছি। বিধাতা শোক-সন্তপ্ত পরিবারে শান্তিবারি বর্ষণ করুন।

নানারূপ দুঃখশোক হর্ষ বিষাদ বহন করিয়া বৎসর শেষ হইতেছে। নব্যভারত আগামী বৎসরে চল্লিশ বৎসরে পদার্পণ করিবে। দুর্ভাগ্যক্রমে নব্যভারত এই সময়ে তাহার প্রতিষ্ঠাতার ঐকান্তিক সেবা ও তৎপরবর্ত্তী সম্পাদকের যত্ন ও চেষ্টা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে, কিন্তু এই দুঃসময়ে আশার কথা এই যে অনেক অকৃত্রিম শুভাকাঙ্ক্ষী ইহাকে সাহায্য করিবার জন্য হস্ত প্রসারিত করিয়া বক্ষে আশ্রয় দিয়াছেন। তাই সহায়হীন, উদ্যমহীন ও নিরাশ হইয়াও নব্যভারত আবার নববর্ষের জন্য বুক বাঁধিয়া অগ্রসর হইতেছে। নব্যভারতের সাহায্য পুরাতন লেখক ও বন্ধু তাঁহাদের ভিতর অনেকেই নব্যভারতের এই দুর্দ্দিনে বিশেষভাবে সাহায্য করিতে স্বীকার করিয়াছেন। সার আশুতোষ চৌধুরী শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল, ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, রাধিকামোহন লাহিড়ী, ইন্দুভূষণ সেন প্রভৃতি পুরাতন হিতৈষীগণ ইহার সেবায় বিশেষরূপে আপনাদের নিয়োজিত করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। নব্যভারত সেইজন্য তাঁহাদের নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ আছে।

আগামী বৎসরের প্রথম সংখ্যায় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় শ্রীযুক্তা হেমলতা দেবী প্রভৃতি দেশপ্রসিদ্ধ লেখক লেখিকাগণের লেখা থাকিবে। যথাসাধ্য ইহার সৌষ্ঠব সাধনের চেষ্টা হইবে। আশাকরি পাঠক পাঠিকা ও গ্রাহক ও অনুগ্রাহকবর্গ সকল ইহাকে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিতে সাহায্য করিবেন। গ্রাহকগণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক আগামী বৎসরের মূল্য পাঠাইয়া দিবেন। চিঠিপত্র বা টাকাকড়ি পাঠাইবার সময় অনুগ্রহপূর্ব্বক গ্রাহক নম্বর লিখিবেন। নতুবা বড়ই অসুবিধায় পড়িতে হয়।

---

# দোল।

দে দোল দে দোল ;
আজ হৃদয় দোলায়
দোল দিয়ে যায়
দখিনা হিল্লোল ;
দে দোল দে দোল।

দোল খেয়ে তুই জাগ,
ওরে পরবশ
ওরে ও অলস
হাতে তুলে নে রে ফাগ,
পুলক রঙ্গে শোণিত অঙ্গে
বহুক্, মাখিয়া ফাগ।
ভিতরে বাহিরে লাল হয়ে ওরে
জাগুক অনুরাগ,
কলুষ-কালিমা, আলস জড়িমা
ঝেড়ে ফেলে তুই জাগ।

উঠুক নামের রোল,
বাজুক সঘনে খোল,
আকাশে বাতাসে শ্বাসে প্রশ্বাসে
ধ্বমুক হরিবোল,
শত চোখে মুখে দীন দুখী মুখে
ফাগ দিয়ে দেরে কোল ;
আপনার করি নেরে বুকে ধরি
দেরে এক সাথে দোল।
ভারতে আবার জাগুক এবার
ঘরে ঘরে সেই দোল,
প্রেম-তরঙ্গে ডাকিয়া রঙ্গে
সবে দেরে সবে কোল
মরতে গগনে বিপিনে গহনে
উঠুক নামের রোল।
দে দোল দে দোল।

শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র বসু।